দ্বাদশ অধ্যায়

জীবের পরিবেশ, বিস্তার ও সংরক্ষণ

ENVIRONMENT, DISTRIBUTION AND CONSERVATION OF LIVING ORGANISMS

প্রধান শব্দসমূহ :
প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী, বায়োম
জীববৈচিত্র্য, কনজারভেশন,
ইন সিটু, এক্স সিটু

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব বাস করে। সব পরিবেশে সব জীব প্রজাতি বাস করতে পারে না। মাছের জন্য চাই জলজ পরিবেশ, মানুষের জন্য চাই স্থলজ পরিবেশ। সব মাছ কি একই জলজ পরিবেশে পাওয়া যায়? না, খাল বিলের মাছ সাধারণত খরস্রোতা নদীতে পাওয়া যায় না, ইলিশ মাছ খাল-বিল-পুকুর-ডোবায় পাওয়া যায় না, তিমি মাছ খরস্রোতা নদীতেও পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ আছে, যার বাইরে এরা বাস করতে পারে না। জীবের পরিবেশ কি? কোনো জীবের চারপাশের জড় (মাটি, পানি, আলো, বাতাস ইত্যাদি) এবং জীবজ (যেমন অন্যান্য জীব তথা উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব) বস্তু দিয়েই ঐ জীবের পরিবেশ গঠিত। আর পরিবেশ অনুযায়ী এদের বিস্তার ঘটে। কতক উদ্ভিদ আছে যা বাংলাদেশের সব জেলাতেই পাওয়া যায়, আবার এমন উদ্ভিদও আছে যা কেবল চট্টগ্রাম অথবা কেবল সুন্দরবনে পাওয়া যায়। জীবের বিস্তার ঘটে তার উপযোগী পরিবেশ অনুযায়ী। পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রজাতির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়, তখন দরকার পড়ে সংরক্ষণ ব্যবস্থা। জীবের পরিবেশ, বাসস্থান, বিস্তার ইত্যাদি বিষয় প্লান্ট ইকোলজি শাখায় আলোচনা করা হয়। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে H. Reiter নামক জার্মান বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম Ecology শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রিক Oikos (অর্থ বাসস্থান) এবং logos (অর্থ জ্ঞান) হতে Ecology শব্দটি এসেছে। ইকোলজি হলো পরিবেশের আন্তঃক্রিয়াদির অধ্যয়ন যা জীবের বণ্টন, প্রাচুর্য, উৎপাদন ও বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে এদের মঙ্গল সাধন করে। এ অধ্যায়ে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে শিক্ষার্থীরা যা যা শিখবে–
❖ প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায় ব্যাখ্যা।
❖ ইকোলজিক্যাল পিরামিডের প্রকারভেদ (চিত্রসহ)।
❖ বিভিন্ন প্রকার পিরামিডের মধ্যে তুলনা।
❖ জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জীবের অভিযোজন প্রক্রিয়ার মধ্যে তুলনা।
❖ বিভিন্ন ধরনের বায়োম সম্পর্কে বর্ণনা।
❖ প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ সম্পর্কে ধারণা।
❖ ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা।
❖ বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য।
❖ বিভিন্ন বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম।
❖ উপকূলীয় বনাঞ্চল উপযোগী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য।
❖ উপকূলীয় এলাকায় বনাঞ্চল তৈরির প্রয়োজনীয়তা।
❖ বিলুপ্তপ্রায় জীব সম্পর্কে ব্যাখ্যা।
❖ জীব বিলুপ্তির কারণসমূহ।
❖ বিলুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।
❖ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি।
❖ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব।
❖ বিলুপ্ত জীব সংরক্ষণে সচেতনতা।

পাঠ পরিকল্পনা	
পাঠ ১	প্রজাতি, জীবগোষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায়
পাঠ ২	বাস্তুতন্ত্র ও ইকোলোজিক্যাল পিরামিড
পাঠ ৩	জীবের অভিযোজন : জলজ পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৪	জীবের অভিযোজন : মরুজ পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৫	জীবের অভিযোজন : লবণাক্ত পরিবেশে অভিযোজন
পাঠ ৬	বায়োম : স্থলজ বায়োম
পাঠ ৭	বায়োম : জলজ বায়োম
পাঠ ৮	প্রাণিভূগোল
পাঠ ৯	ওরিয়েন্টাল অঞ্চল
পাঠ ১০	বাংলাদেশের বনাঞ্চল : চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল
পাঠ ১১	বাংলাদেশের বনাঞ্চল : পর্ণমোচী বা পত্রঝরা বনাঞ্চল
পাঠ ১২	বাংলাদেশের বনাঞ্চল : ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল
পাঠ ১৩	উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনী
পাঠ ১৪	বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীব
পাঠ ১৫	জীববৈচিত্র্য
পাঠ ১৬	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ ১৭	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব
পাঠ ১৮	IUCN Red List Categories

CamScanner

প্রজাতি (Species)

বিজ্ঞানীদের কাছে জীবের পরিচিতি সব সময়ই প্রজাতি নির্ভর। পৃথিবীতে কত জীব আছে তা বলা হয় না, বা জানতে চাওয়া হয় না, জানতে চাওয়া হয় কত প্রজাতির জীব আছে। বাংলাদেশে কত প্রজাতির মাছ আছে, বা কত প্রজাতির পুষ্পক উদ্ভিদ আছে তাই জানতে চাওয়া হয়। পৃথিবীর সকল মানুষ এক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। তা হলে প্রজাতি কি? **প্রজাতি বলতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিলসম্পন্ন একদল জীবকে** (উদ্ভিদ, প্রাণী) **বোঝায় যারা নিজেদের মধ্যে যৌন মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম কিন্তু অন্যদলের সদস্যের সাথে মিলনে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।** একই প্রজাতির সদস্যসমূহ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। সাধারণত একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত দুটি জীব তাদের মধ্যে যৌন মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়। দুটি জীবের মধ্যে যৌন মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপন্ন না হলে ধরে নেয়া হয় জীব দুটি একই প্রজাতিভুক্ত নয়, তারা পৃথক প্রজাতিভুক্ত। উর্বর সন্তান উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয়কৃত স্পিশিস হলো বায়োলজিক্যাল স্পিশিস, আর প্রজাতির এ ধারণাকে বলা হয় **বায়োলজিক্যাল স্পিশিস কনসেপ্ট।**

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রজাতির গতানুগতিক ধারণা ভিন্ন রকম, কারণ দুটি মিলসম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস করে তাদের উর্বর সন্তান সৃষ্টি হয় কিনা তা পরীক্ষা করা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই **শ্রেণিবিন্যাসবিদগণ কেবল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই প্রজাতি নির্ণয় করে থাকেন।** প্রজাতি নির্ণয়ে এক সময় কেবল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে ধরা হলেও বর্তমানে প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য, পরাগরেণুর বৈশিষ্ট্য, ক্রোমোসোমাল বৈশিষ্ট্য, এমনকি DNA, RNA ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যও আমলে নেয়া হয়।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দুটি ভিন্নজীবকে কখন পৃথক প্রজাতিভুক্ত করা হবে? এর মধ্যেও মতের ভিন্নতা আছে। বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে জীব দুটি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে পার্থক্যমণ্ডিত হতে হবে এবং এ পার্থক্য হতে হবে বিচ্ছিন্ন, এদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নতা বা মাধ্যমিক পর্যায় থাকলে পৃথক প্রজাতিতে বিভক্ত করা যাবে না।

একটি সহজ উদাহরণ দিলে এটি বুঝতে সুবিধা হবে। বাংলাদেশে পাটের দুটি প্রজাতি চাষ করা হয়। প্রজাতি দুটি হলো *Corchorus capsularis* (সাদা পাট) এবং *Corchorus olitorius* (তোষা পাট)। গঠন বৈশিষ্ট্যে প্রজাতি দুটি অত্যন্ত কাছাকাছি। এদের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য ফলের আকৃতি ও আকারে।

প্রজাতি দুটির ফলের পার্থক্য বিচ্ছিন্ন (discontinuous)। চিত্রে প্রদর্শিত মাধ্যমিক পর্যায়গুলোর অস্তিত্ব থাকলে প্রজাতি দুটিকে আলাদা করা হতো না, দুটি একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হতো। যেহেতু এদের মধ্যে কোনো নিরবচ্ছিন্নতা নেই (continuity নেই) সেহেতু প্রজাতি দুটি পৃথক। *C. capsularis*-এর সাথে *C. capsularis* ইন্টারব্রিডের মাধ্যমে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। *C. olitorius*-এর সাথে *C. olitorius* ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু *C. capsularis*-এর সাথে *C. olitorius* ইন্টারব্রিড করে না বা ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। কাজেই এরা দুটি পৃথক প্রজাতি। তাহলে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ :

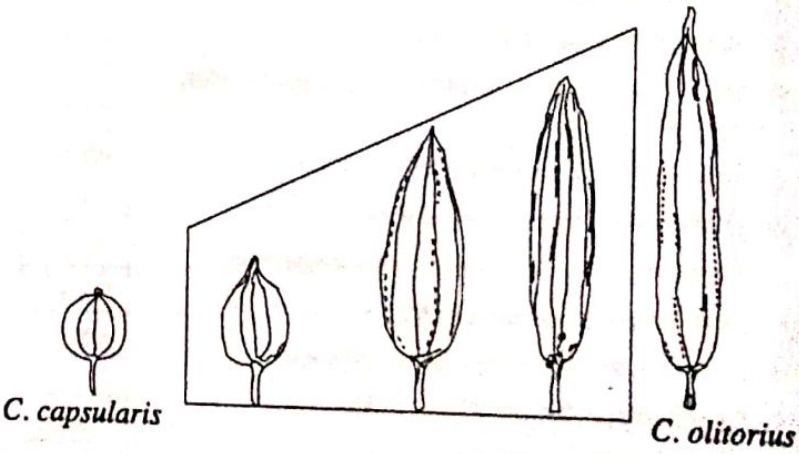

(i) বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক মিলসম্পন্ন এক দল জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব, ছত্রাক)।

(ii) একই প্রজাতিভুক্ত জীব একটির সাথে অপরটি ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদন করতে পারে কিন্তু অন্য প্রজাতিভুক্ত কোনো জীবের সাথে ইন্টারব্রিড করে উর্বর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম।

(iii) একই প্রজাতিভুক্ত বিভিন্ন জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য থাকলেও তা হবে নিরবচ্ছিন্ন (continuous)।

(iv) একটি প্রজাতিভুক্ত জীবসমূহ একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত।

CamScanner

প্রজাতি হলো শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতির সর্বনিম্ন একক যা দুটি পদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, যেমন— *Corchorus capsularis*, *C. olitorius* (গণ নাম একবার পূর্ণ লেখার পর পরবর্তীতে প্রথম অক্ষর দিয়ে সংক্ষিপ্ত করার নিয়ম আছে)।

নতুন প্রজাতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমি যে মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকি তা হলো : (i) নতুন বলে শনাক্তকৃত প্রজাতিটি তার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ প্রজাতি থেকে অন্তত ২টি বৈশিষ্ট্য পার্থক্যমণ্ডিত হতে হবে, (ii) পার্থক্য ২টি হবে ধারাবাহিকতাহীন (discontinuous) এবং (iii) পরবর্তী বংশধরে গমন ও প্রকাশযোগ্য-heritable।

পৃথিবীতে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা

পৃথিবীতে বর্তমান বর্ণনাকৃত (described) ও অনুমিত (estimated) প্রজাতির সংখ্যা নিম্নরূপ (sourcse : Jeffries. M.J. 1997; Prance, G.T. 1992)। বর্তমান তথ্য অনুযায়ী এ সংখ্যার উর্ধ্বমুখী পরিবর্তন এসেছে।

ট্যাক্সার নাম	বর্ণনাকৃত প্রজাতির সংখ্যা	অনুমিত প্রজাতির সংখ্যা
ব্যাকটেরিয়া	৪,০০০	১০,০০,০০০
ছত্রাক	৭২,০০০	১৫,০০,০০০
শৈবাল	৪০,০০০	২,০০,০০০
লাইকেন	১৩,৫০০	২০,০০০
মস	৮,০০০	৯,০০০
লিভারওর্টস	৬,০০০	৭,০০০
টেরিডোফাইটা	১২,০০০	১২,৫০০
জিমনোস্পার্ম	৬৫০	৬৫০
অ্যানজিওস্পার্ম	২,৫০,০০০	৩,০০,০০০

বাংলাদেশে উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা

'বাংলাদেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষ' অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে বর্ণনাকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির (প্রকরণসহ) সংখ্যা নিম্নরূপ :

ব্যাকটেরিয়া	১৭১	ব্রায়োফাইটা	২৪৮
সায়ানোব্যাকটেরিয়া	৩০০	টেরিডোফাইটা	১৯৫
ছত্রাক	২৭৫	নগ্নবীজী উদ্ভিদ	০৫
শৈবাল	২,২৪৫	আবৃতবীজী উদ্ভিদ	৩৬১১

এ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর গত বারো-তেরো বছরে শৈবাল ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের আরো কিছু প্রজাতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। কাজেই প্রকৃত সংখ্যা উদ্ধৃত সংখ্যার চেয়ে একটু বেশি হবে। আবৃতবীজী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা ৪০০০ বা আরো কিছু বেশি হতে পারে বলে অনুমান করা হয়।

জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশন (Population)

অসংখ্য প্রজাতির জীব নিয়ে এ জীবজগৎ গঠিত। সময়ের ব্যবধানে এসব প্রজাতির সংখ্যা ও ধরন পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আজকের পৃথিবীতে যেসব জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) লক্ষ্য করা যায়, কয়েক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে জীবের সংখ্যা ও ধরন অন্য রকম ছিল। জীবসমূহ সাধারণত **জীবগোষ্ঠী** তথা **পপুলেশন**-এ (population) বিন্যস্ত থাকে।

একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতির একদল জীবকে বলা হয় পপুলেশন বা জীবগোষ্ঠী (Population is a set of organisms belonging to the same species and occupying a particular area at the same time)। **একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ও সম্মিলিতভাবে পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল সব প্রজাতির সব পপুলেশন মিলে গঠন করে একটি জীব সম্প্রদায় বা কমিউনিটি** (community)।

সব জীবের সব কমিউনিটি মিলিতভাবে তৈরি করে **জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়ার** (biosphere)। বায়োস্ফিয়ারের জীবসমূহ একদিকে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল, অপরদিকে পৃথিবীর ভৌত পরিবেশের ওপরও নির্ভরশীল। ভৌত পরিবেশের মধ্যে আছে (i) বায়ুমণ্ডল (atmosphere), (ii) বারিমণ্ডল (hydrosphere) এবং (iii) **অশ্মমণ্ডল** (lithosphere)। বায়োস্ফিয়ার ও বায়োস্ফিয়ারের সাথে বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডলের আন্তঃক্রিয়াকে বলা হয় **ইকোস্ফিয়ার** (ecosphere)।

জীবগোষ্ঠী বা পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Population)

জীবগোষ্ঠীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(১) **ঘনত্ব বা বিস্তার :** পপুলেশন ছোটো হতে পারে, আবার বেশ বড়োও হতে পারে, তবে পপুলেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এর অন্তর্ভুক্ত জীবের **ঘনত্ব ও বিস্তার** (density and dispersion)। পপুলেশন এতো বড়ো হতে পারে যে সামগ্রিকভাবে এটি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না, পর্যবেক্ষণ করতে হয় নমুনা অংশের। বিভিন্ন নমুনা অংশের পর্যবেক্ষণের পর ঘনত্বের বিচারে তা প্রকাশ করা হয়। **একটি সময়ে একটি একক আয়তন জায়গায় কোনো প্রজাতির কতটি সদস্য আছে তা হলো পপুলেশনের ঘনত্ব** (population density)। যেকোনো প্রজাতির পপুলেশন ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নতর হয়ে থাকে। আবার একই অবস্থানের বিভিন্ন ঋতুতে বা ভিন্ন ভিন্ন বছরে কোনো প্রজাতির পপুলেশন ঘনত্ব ভিন্নতর হয়।

কোনো পপুলেশন বণ্টনের ভৌগোলিক বিস্তারের সীমাকে বলা হয় ঐ পপুলেশনের **বিস্তার পরিসর** (range)। বিস্তার পরিসরে কোনো প্রজাতির বিস্তার সমপ্রকৃতির (uniform) হতে পারে, অসমপ্রকৃতির (random) হতে পারে, আবার গুচ্ছাকারও (clustered) হতে পারে।

(২) **জন্ম-মৃত্যুর হার :** প্রতিটি পপুলেশনের জন্ম ও মৃত্যু হার থাকে। সময়ের সাথে পপুলেশনের পরিবর্তন ঘটে, আবার পৃথিবীর অঞ্চলভেদেও এর পরিবর্তন ঘটে। জন্ম ও মৃত্যুর কারণে এরূপ পরিবর্তন ঘটে থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে **প্রতি বছর প্রতি হাজারে কতটি শিশু জন্ম নিল তাকে জন্মহার বলা হয়**। জন্ম ও মৃত্যু হার সমান হলে পপুলেশন বৃদ্ধি শূন্য (zero population growth) হয়।

(৩) **সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি :** প্রতিটি পপুলেশনের একটি **প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি** (biotic potential) থাকে। সবচেয়ে সুবিধাজনক পরিবেশে কোনো পপুলেশন সর্বাধিক কতটা বৃদ্ধি পেতে পারে তাকে বলা হয় প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি। বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যাবৃদ্ধি শক্তি ভিন্নতর হয়ে থাকে। দেখা গেছে একটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ দশ ঘণ্টায় সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে ১০৭,৩৭,৪১,৮২৪টি হতে পারে। উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংখ্যাবৃদ্ধির শক্তি তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

(৪) **সীমিতকরণ শক্তি :** প্রকৃতিই পপুলেশনের বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। কাজেই কোনো পপুলেশনই তার প্রচ্ছন্ন সংখ্যাবৃদ্ধির শক্তিকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজে লাগাতে পারে না। পরিবেশীয় প্রভাবকসমূহ পপুলেশনের বৃদ্ধিকে সীমিত রাখে। বিবর্তনের কার্যক্রম পপুলেশনেই শুরু হয়।

(৫) **বয়সের বণ্টন :** পপুলেশনে বিভিন্ন বয়স দল (Age group) থাকে। বিভিন্ন বয়সের উদ্ভিদ মিলে উদ্ভিদ পপুলেশন গঠন করে। পপুলেশনে বিদ্যমান বিভিন্ন বয়স দল বা Age group এর শতকরা হারকে বয়সের বণ্টন বলে। বয়সের বণ্টন পপুলেশনের জন্মহার ও মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে।

(৬) **জীবগোষ্ঠীর ভারসাম্য :** পরিবেশের ক্ষতিকারক উপাদান যদি না থাকে এবং বহন ক্ষমতা যদি ঠিক থাকে তাহলে জীবগোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হবে।

(৭) **জীবগোষ্ঠীর বৃদ্ধি :** জীবগোষ্ঠীর হ্রাস-বৃদ্ধি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। জীবগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সদস্য সংখ্যা বাড়লে (জন্মগ্রহণ ও বাইরে থেকে আগমন ঘটলে) জীবগোষ্ঠীর আকারও বড়ো হয়। পরিবেশে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান সদস্য সংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জীবগোষ্ঠীরও বৃদ্ধি ঘটে।

পপুলেশন বা উদ্ভিদ প্রজাতি বণ্টনে প্রধান প্রভাবকসমূহ

(১) **জলবায়ুগত প্রভাবক :** যেমন— সূর্যালোক, পানি ও বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ইত্যাদি পপুলেশনের সার্বিক গঠনে ভূমিকা রাখে।

২। **মৃত্তিকাজনিত প্রভাবক :** যেমন— মাটিতে পানির পরিমাণ, মাটির তাপমাত্রা, মাটির বিক্রিয়া, মাটির জৈব পদার্থ, মাটির বাতাস ইত্যাদি।

৩। **ভূ-সংস্থান সম্পর্কিত প্রভাবক :** যেমন— সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা, পাহাড়ের ঢাল ইত্যাদি।

৪। **জীব সম্পর্কিত প্রভাবক :** যেমন– উদ্ভিদের সাথে উদ্ভিদের সম্পর্ক, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সম্পর্ক, ধারক উদ্ভিদ ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ সম্পর্ক ইত্যাদি।

জীব সম্প্রদায় (Biotic Community)

সাধারণত পৃথিবীর কোনো স্থানে বা কোনো পরিবেশেই এককভাবে কোনো জীব বা জীবগোষ্ঠী বাস করে না বা বাস করতে পারেও না। সাধারণত বিভিন্ন ধরনের জীবসমূহ একই পরিবেশে একই স্থানে মিলেমিশে বাস করে। একই পরিবেশে, একই স্থানে বসবাসকারী বিভিন্ন জীব প্রজাতিকে একত্রে বলা হয় জীব সম্প্রদায়। **জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের প্রাকৃতিক সমাবেশ, যারা প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে একে অন্যের প্রতি সহনশীল ও নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল** (A biotic community is a naturally occurring assemblage of plants and animals that live in the same environment are mutually sustaining and interdependent and are constantly fixing and dissipating energy- Smith 1966)। সহজভাবে বলা যায়, জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবসমূহের সমষ্টিগত অবস্থান। একটি বড়ো মরুভূমি বা তৃণভূমির যেমন নির্দিষ্ট জীব সম্প্রদায় থাকে, আবার ছোটো একটি ডোবা, তারও একটি জীব সম্প্রদায় থাকে।

জীব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য

১। **প্রজাতির বিভিন্নতা :** প্রত্যেক জীব সম্প্রদায় বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত। এদের সংখ্যা ও অবস্থান সম্প্রদায়ের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ভিন্নতর হয়। প্রত্যেক জীব সম্প্রদায়ের জীবসমূহ খাদ্য, আশ্রয়, প্রজনন ইত্যাদি ব্যাপারে একে অন্যের ওপর ও জড় পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল হয়।

২। **বৃদ্ধির ধরন ও গঠন :** একটি জীব সম্প্রদায়ে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবের বৃদ্ধির ধরন ও গঠন বিভিন্ন রকম হয়।

৩। **আধিপত্য :** জীব সম্প্রদায়ের প্রকৃতি নির্ণয়ে সম্প্রদায়ভুক্ত সব প্রজাতি সমান ভূমিকা পালন করে না। সম্প্রদায়ভুক্ত বহু প্রজাতির মধ্যে মাত্র কয়েকটি প্রজাতি এদের সংখ্যা, আকার ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা পুরো সম্প্রদায়ের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে।

৪। **স্তরবিন্যাস :** প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের অবস্থান অনুযায়ী লম্বালম্বি স্তরবিন্যাস থাকে, যেমন একটি বন সম্প্রদায়ে (forest community)– (i) **ওভারস্টোরি স্তর-** সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষগুলো এ স্তর গঠন করে থাকে এবং অন্যদের ওপর ছায়া দিয়ে থাকে। এ স্তরে বসবাসকারী পাখিও ভিন্ন প্রজাতির হয়। (ii) **আন্ডারস্টোরি-** ওভারস্টোরি থেকে অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার বৃক্ষ প্রজাতিগুলো নিয়ে এ স্তর গঠিত। এরাও তেমন ছায়াপ্রিয় নয়। (iii) **ট্রান্সগ্রেসিভ স্তর-** ছায়াপ্রিয় উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো নিয়ে এ স্তর গঠিত। (iv) **চারাস্তর-** বড়ো বৃক্ষের চারা এবং তৃণজাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে এ স্তর গঠিত। (v) **ভূ-সংলগ্ন স্তর-** এ স্তরে প্রচুর হিউমাস থাকে এবং এ স্তরে বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও পোকামাকড় ইত্যাদি থাকে। ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো বিয়োজক অর্থাৎ জৈব বস্তুর পঁচনে সাহায্য করে।

৫। **ক্রমাগমন :** কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে জীব সম্প্রদায় বহুদিন বসবাসের কারণে ঐ পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে কোনো কোনো জীবপ্রজাতির অবলুপ্তি ঘটে আর কোনো কোনো জীবপ্রজাতির আবির্ভাব ঘটে। একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত এমন হতে থাকে। একটি পুকুর বহুদিনের ব্যবধানে একটি জঙ্গলে পরিণত হতে পারে।

৬। **খাদ্যস্তর গঠন ও পুষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা :** একটি সম্প্রদায়ভুক্ত জীবপ্রজাতিসমূহের মধ্যে একটি খাদ্য শৃঙ্খল ও একটি শক্তি প্রবাহ নিশ্চিত হয়। এতে উৎপাদনকারী, তৃণভোজী, মাংসভোজী, পচনকারী সব ধরনের জীবেরই সমাবেশ ঘটে।

৭। **সময়ের সাথে সম্প্রদায়ের পরিবর্তন :** সময় ও ঋতু পরিবর্তনের সাথে সম্প্রদায়ভুক্ত জীব প্রজাতিরও পরিবর্তন হয়। তাই বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন জীবপ্রজাতির সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীত, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে এ পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়।

বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম (Ecosystem)

কোনো স্থানের (একটি পুকুর, তৃণভূমি, চারণভূমি, জঙ্গল) **জীব সম্প্রদায় ও এদের পরিবেশ নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার গতিময় পদ্ধতিকে বলা হয় বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম।** জড় (মাটি, পানি, আলো, জৈব ও অজৈব বস্তু) এবং **জীব** (উদ্ভিদ, প্রাণী, ছত্রাক, অণুজীব) উপাদান দিয়ে একটি বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয়।

কোনো **জীব সম্প্রদায়ের** (Community) জীবসমূহ বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচতে পারে না–তারা তাদের চারপাশের জড় (অজীব) উপাদান, যেমন— বায়ু, পানি, মাটি/পাথর ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। জীবসমূহ তাদের **অজৈব পুষ্টি** (Inorganic nutrient), যেমন— কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং অন্যান্য রাসায়নিক মৌল জড় পরিবেশ থেকেই গ্রহণ করে থাকে। একটি জীব সম্প্রদায়ের জীবসমূহ তাদের চারপাশের জড় তথা অজৈব (abiotic) পরিবেশের সাথে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে তুলে একটি **ইকোসিস্টেম**।

ইকোসিস্টেম সুদীর্ঘ সময় টিকে থাকার মতো সামর্থ্য থাকে। টিকে থাকার জন্য তিনটি বিষয় দরকার; যথা— (i) পুষ্টির প্রাপ্যতা– পুষ্টি সীমাহীনভাবে রিসাইকল হয়; (ii) বর্জ্য পদার্থের বিষাক্ততা নাশ– বিয়োজক কর্তৃক নিঃসৃত অ্যামোনিয়া বিষাক্ত কিন্তু এটি *Nitrosomonas* গ্রহণ করে এবং তার শক্তির জন্য ব্যবহার করে; (iii) শক্তির প্রাপ্যতা– শক্তি পুনঃউৎপাদন (রিসাইকল) হয় না, তাই বাইর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পেতে হয় যা সূর্য থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে আসে।

ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় আলোক/সূর্য শক্তি রাসায়নিক শক্তি হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে কার্বন যৌগে স্থান লাভ করে। কার্বন যৌগের রাসায়নিক শক্তি খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। শ্বসনের মাধ্যমে নির্গত শক্তি জীবিত জীবসমূহ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় এবং তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। তাপ শক্তি ইকোসিস্টেম থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু পুষ্টি উপাদান ইকোসিস্টেমে থেকে যায় অফুরন্ত সময়ের জন্য।

যে ইকোসিস্টেম পুষ্টি উপাদান চারপাশের পরিবেশের সাথে বিনিময় করে না, তা হলো **বদ্ধ ইকোসিস্টেম** (Closed ecosystem)। একটি হ্রদ-ইকোসিস্টেমে পুষ্টি উপাদান সঞ্চয় করে রাখার মতো তিনটি স্থান আছে; যথা— (i) **বায়োমাস** (জীবিত জীব); (ii) **লিটার** (মৃত জৈববস্তু) এবং (iii) **মাটি**। পুষ্টি উপাদান এই তিনটি স্থানের মধ্যে প্রবাহিত হয়। **উন্মুক্ত ইকোসিস্টেমে** (Open ecosystem) পুষ্টি উপাদান এই তিনটি স্থানের মধ্যে এবং চারপাশের পরিবেশের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

একটি সুস্থিত (Stable) ইকোসিস্টেমে উদ্ভিদ ক্রমাগমন (succession) ঘটে না এবং সুস্থিত ইকোসিস্টেমের জীব সম্প্রদায়কে চূড়ান্ত জীব সম্প্রদায় বা **ক্লাইমেক্স কমিউনিটি** বলে। সাধারণত দুটি নিয়ামক–(i) তাপমাত্রা এবং (ii) বৃষ্টিপাত কোনো এলাকার সুস্থিত ইকোসিস্টেমের প্রকৃতি নির্ণয় করে থাকে। অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ঝড়, মানুষের কর্মকাণ্ড ইত্যাদি উত্তেজনা (disturbance) কোনো ইকোসিস্টেমে পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

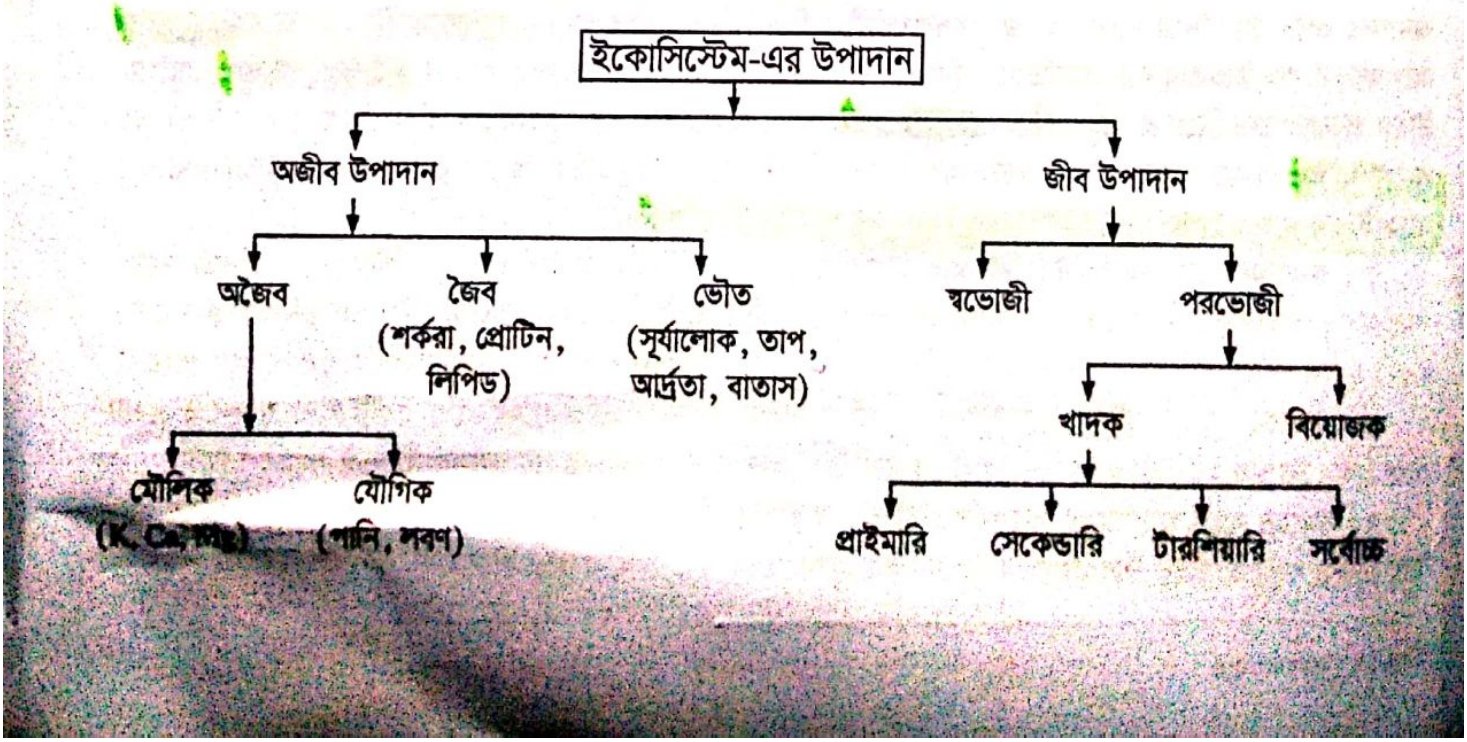

একটি বাস্তুতন্ত্রের তথা ইকোসিস্টেমের জীব উপাদান হলো :

১। **উৎপাদক (Producer) :** উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদ। পুকুর বা বিলের প্রধান উৎপাদক হলো **ফাইটোপ্লাংক্টন** (ভাসমান ক্ষুদ্র উদ্ভিদ = *Spirulina, Eudorina, Pandorina* etc.)। সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন করে। এই খাদ্যই প্রাণিজগতকে টিকিয়ে রাখে। প্রকৃতপক্ষে সবুজ উদ্ভিদ তাদের উৎপাদিত খাদ্যের ভেতরে সূর্যশক্তি ধরে রাখে যা পরে খাদকে প্রবাহিত হয়। একটি নির্দিষ্ট এলাকায় (সাধারণত প্রতি বর্গমিটারে) সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্যে যে পরিমাণ শক্তি বন্ধন হয় তাকে বলা হয় **মোট উৎপাদন** (Gross production) এবং শ্বসনকার্যে শক্তি খরচ হওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় **প্রকৃত উৎপাদন** (Net production)। প্রতি ইউনিট সময়ে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদিত হয় সেই হারকে বলা হয় **Productivity**।

২। **খাদক (Consumer) :** উৎপাদক খেয়ে যারা বেঁচে থাকে তারাই খাদক। খাদক হলো প্রাণিকুল। (i) পুকুরে **জুপ্লাংক্টন** (ক্ষুদ্রাকায় প্রাণী = *Cyclops, Cypris, Daphnia*) সরাসরি ফাইটোপ্লাংক্টন খেয়ে থাকে, তাই জুপ্লাংক্টন হলো **প্রাথমিক খাদক** (Primary consumer)। (ii) তিতপুঁটি, মলা, খলিশা ইত্যাদি জুপ্লাংক্টন খেয়ে থাকে, তাই এরা হলো **সেকেন্ডারি খাদক**। (iii) গজার, শোল, বোয়াল, চিতল ইত্যাদি মলা, খলিশা মাছ খেয়ে থাকে তাই এরা হলো **টারশিয়ারি খাদক**। মাছরাঙা, বক এরাও টারশিয়ারি খাদক হতে পারে।

৩। **বিয়োজক (Decomposer) :** বাস্তুতন্ত্রের মৃত জীবদেহ বা দেহাংশ পচিয়ে জৈব ও অজৈব পদার্থরূপে রূপান্তর করে থাকে কতক মৃত্তিকাবাসী ও জলবাসী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক। বিয়োজক জীবসমূহ আমিষ, স্টার্চ, লিপিড এবং অন্যান্য প্রায় সকল জৈববস্তু বিশ্লেষণ করে রূপান্তর করার এনজাইম তৈরি করে থাকে এবং রূপান্তর কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। তাই ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক হলো **বিয়োজক**। মৃত জীবের জৈব পদার্থ খেয়ে থাকে বলে এদেরকে বলা হয় **স্যাপ্রোফায** (saprophage)। এদেরকে **ট্রান্সফরমারও** বলা হয়। যারা মৃত জৈববস্তু থেকে বাহ্যিক হজম (external digestion) প্রক্রিয়ায় পুষ্টি গ্রহণ করে তারা **Saprotrophs** নামেও পরিচিত। এরা মৃত জৈব বস্তুতে হজমকারী এনজাইম নিঃসৃত করে ফলে দেহের বাইরেই খাদ্য হজম হয়, তখন এরা শোষণ করে তা দেহে গ্রহণ করে। কতক জীব অভ্যন্তরীণ হজম (internal digestion) প্রক্রিয়ায় মৃত জৈববস্তু থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে, এরা হলো Detritivores, যেমন কেঁচো। অবশ্য এরা খাদ্য শৃঙ্খলের অংশ নয়, তবে বিয়োজক না থাকলে খাদ্য শৃঙ্খল বন্ধ হয়ে যায়।

খাদ্য শৃঙ্খল (Food Chain) : উৎপাদক থেকে চূড়ান্ত খাদক পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের জীবসমূহ একক অনুক্রমে একটি সরল অশাখ চেইনের মতো অবস্থান করলে তাকে **খাদ্য শৃঙ্খল** বা **ফুড চেইন** বলে। একটি খাদ্য শৃঙ্খলে প্রতিটি খাদক স্তরের জীবসমূহ তার পূর্ববর্তী স্তরের জীবসমূহকে খেয়ে থাকে। খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তি একস্তর থেকে পরবর্তী স্তরে প্রবাহিত হয়। খাদ্য শৃঙ্খলে বিভিন্ন খাদ্যস্তরকে **ট্রফিক লেভেল** (trophic level) বলে।

কয়েকটি খাদ্য শৃঙ্খল :

	উৎপাদক	→ প্রাথমিক খাদক	→ সেকেন্ডারি খাদক	→ টারশিয়ারি খাদক	পরিবেশ
১।	ফাইটোপ্লাংক্টন	→ জুপ্লাংক্টন	→ ছোটো মাছ (মলা, তিতপুঁটি)	→ শোল, গজার, বোয়াল বা মাছরাঙা, বক	১। পুকুর বা বিলের খাদ্য শৃঙ্খল
২।	ফাইটোপ্লাংক্টন	→ জুপ্লাংক্টন	→ ছোটো মাছ (হেরিং ফিস)	→ হাঙ্গর	২। সমুদ্রের খাদ্য শৃঙ্খল
৩।	সবুজ উদ্ভিদ	→ গ্রাসহপার	→ ব্যাঙ	→ বাজপাখি	৩। স্থল পরিবেশের খাদ্য শৃঙ্খল

খাদ্য জাল (Food Web) : যেকোনো জীবসম্প্রদায়ে (Biotic community) বা ইকোসিস্টেমে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল বিরাজ করে। একটি খাদ্য শৃঙ্খলের কতক খাদক অন্য এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের জীবও খেয়ে থাকে। এর ফলে খাদক পর্যায়ে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর সংযুক্ত থাকে। কোনো জীবসম্প্রদায় বা ইকোসিস্টেমে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর যুক্ত থাকার অবস্থাকে খাদ্য জাল বা ফুডওয়েভ বলে।

CamScanner

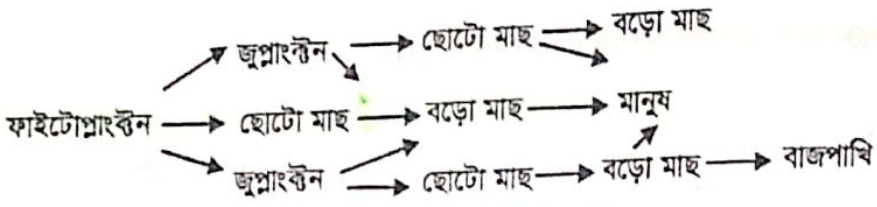

চিত্র: একটি ছোটো খাদ্যজালের নকশা

মানুষ, *Spirulina* (উৎপাদক), মলা মাছ (সেকেন্ডারি খাদক), শোল, গজার, বোয়াল মাছ (টারশিয়ারি খাদক) সবই খায়। তাই মানুষ সর্বভুক।

ইকোলজিক্যাল পিরামিড (Ecological Pyramid)

সাধারণত দেখা যায় একটি ইকোসিস্টেমে উৎপাদকের (সবুজ উদ্ভিদ) তুলনায় প্রাথমিক খাদকের (যারা সরাসরি সবুজ উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে) সংখ্যা কম থাকে, আবার প্রাথমিক খাদকের তুলনায় সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যা কম থাকে; সেকেন্ডারি খাদকের তুলনায় টারশিয়ারি খাদকের সংখ্যা আরও কম থাকে। খাদ্যস্তরগুলোর মধ্যকার এরূপ সম্পর্ক নিয়ে নকশা আঁকলে দেখা যাবে একটি পিরামিডের আকৃতি ধারণ করেছে। **বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্যশৃঙ্খলের বিন্যাস সম্পর্কিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে।** ইকোলজিক্যাল পিরামিড নিম্নরূপ হতে পারে-১। সংখ্যার পিরামিড ২। বায়োমাস-এর পিরামিড এবং ৩। শক্তির পিরামিড।

চিত্র ১২.১ : তৃণভূমির একটি সংখ্যার পিরামিড।

১। সংখ্যার পিরামিড (Pyramid of numbers) : সাধারণত প্রারম্ভিক খাদ্যস্তরে (প্রডিউসার) জীবের সংখ্যা শেষ খাদ্যস্তরের জীবের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি থাকে। কোনো ইকোসিস্টেমে খাদ্যস্তরের জীবের **সংখ্যাভিত্তিক সম্পর্ক দেখানোর জন্য অঙ্কিত নকশাকে সংখ্যার পিরামিড বলে।** তৃণভূমির একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জন্মানো উদ্ভিদের সংখ্যার তুলনায় ঐ তৃণসমূহের ওপর নির্ভরশীল প্রাথমিক খাদকের সংখ্যা কম হবে। আবার ঐ খাদকের সংখ্যার তুলনায় এদের ওপর নির্ভরশীল সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যা আরও কম হবে। সেকেন্ডারি খাদকের সংখ্যার তুলনায় টারশিয়ারি খাদকের সংখ্যা আরও কম হবে। **অর্থাৎ জীবের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে কমে একটি ত্রিকোণাকার পিরামিড আকৃতি ধারণ করে।** সর্বোচ্চ খাদকের সংখ্যা সবচেয়ে কম। **সংখ্যার পিরামিডে প্রতিটি খাদ্যস্তরে (trophic level) জীবের সংখ্যা দেখানো হয়।**

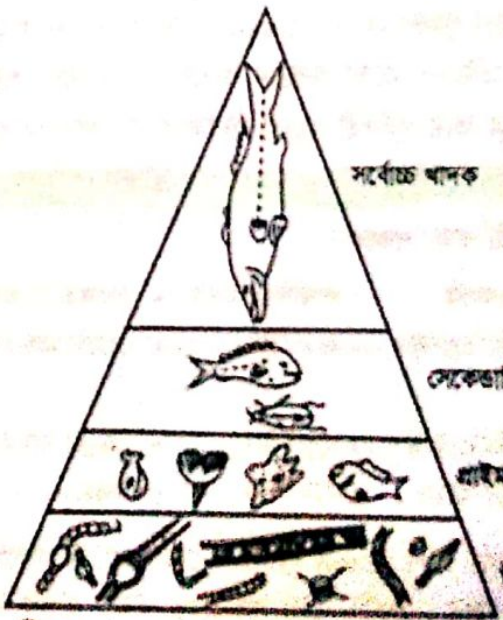

চিত্র ১২.২ : পুকুরের একটি সংখ্যার পিরামিড।

কিন্তু সবসময় সংখ্যার পিরামিড ঊর্ধ্বমুখী হয় না। উদাহরণস্বরূপ, বৃক্ষের বাস্তুতন্ত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। বড়ো একটি বৃক্ষে শত শত কীট-পতঙ্গ বাস করে। এসব কীট-পতঙ্গনির্ভর পরজীবী অণুজীবের সংখ্যা কীট-পতঙ্গ অপেক্ষা শত শত গুণ বেশি হতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদক, প্রাইমারি খাদক ও সেকেন্ডারি খাদক সংখ্যার ভিত্তিতে সাজানো হলে একটি উল্টানো পিরামিডের মতো দেখায়।

২। জীবভর বা বায়োমাস-এর পিরামিড (Pyramid of biomass) : বায়োমাস (biomass) হলো কোনো একটি

ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবস্থিত সকল জৈববস্তুর মোট ভর (mass) বা মোট পরিমাণের (amount) হিসাব (Biomass is a quantitative estimate of the total mass or amount of living material)। অর্থাৎ, জীবজ পদার্থের মোট শুষ্ক ওজনই হলো বায়োমাস। বায়োমাস, মোট ঘনফল হিসেবে (total volume), শুষ্ক ওজন হিসেবে (dry weight) এবং তাজা ওজন হিসেবে (fresh weight) প্রকাশ করা যায়। কোনো একটি ইকোসিস্টেমের খাদ্যস্তরগুলোর বায়োমাস নির্ণয় করে এদের ফলাফল দিয়ে অঙ্কিত রৈখিক চিত্রকে বায়োমাস-এর পিরামিড বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি বটবৃক্ষের বায়োমাস, এর ওপর নির্ভরশীল পাখির বায়োমাস হতে বেশি। আবার পাখিগুলোর বায়োমাস, তাদের ওপর নির্ভরশীল পরজীবী পোকামাকড়গুলোর বায়োমাস অপেক্ষা বেশি। বায়োমাসের পিরামিডে প্রতিটি খাদ্যস্তরের (trophic level) মোট বায়োমাসের পরিমাণ দেখানো হয়। তবে পরজীবী (parasite) খাদ্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে বায়োমাসের পিরামিড বিপরীতমুখী হয়।

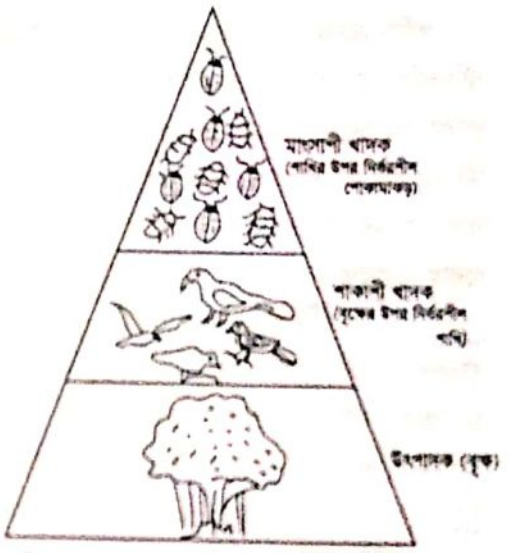

চিত্র ১২.৩ : একটি বায়োমাস-এর পিরামিড।

৩। শক্তির পিরামিড (Pyramid of energy) : একটি ইকোসিস্টেমের নির্দিষ্ট এলাকাতে এবং নির্দিষ্ট সময়কালে বিভিন্ন খাদ্যস্তরের জীব কর্তৃক ব্যবহৃত মোট শক্তির হিসাব অনুযায়ী অঙ্কিত নকশাকে শক্তির পিরামিড বলা হয়। সাধারণত কোনো ইকোসিস্টেমের এক বর্গমিটার এলাকা এবং এক বছর সময়কালের একক হিসেবে ব্যবহৃত শক্তির হিসাব করা হয়।

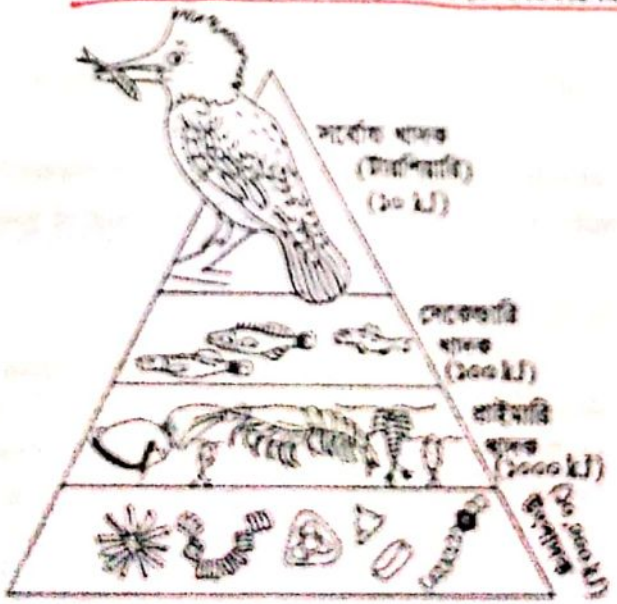

চিত্র ১২.৪ : পুকুরের একটি শক্তির পিরামিড (শক্তির সংরক্ষণ সম্পর্কীয়)।

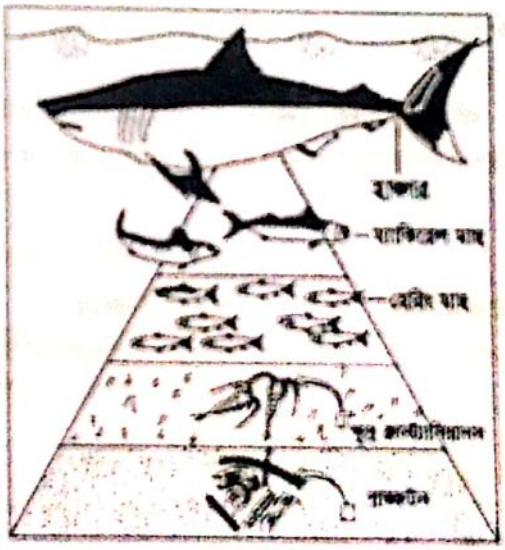

চিত্র ১২.৫ : সমুদ্রের একটি শক্তির পিরামিড।

কোনো ইকোসিস্টেমের এক বর্গমিটার এলাকায় এক বছর সময়কালে প্রথম খাদ্যস্তরের জীব তথা উৎপাদক যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করে, তা দ্বিতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি থেকে বেশি; আবার দ্বিতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি তৃতীয় স্তরের জীব কর্তৃক সংগৃহীত শক্তি থেকে বেশি। চতুর্থ স্তরের জীব সবচেয়ে কম শক্তি ব্যবহার করে। শক্তির পিরামিডে প্রতি খাদ্যস্তরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, একটি পুকুরের ফাইটোপ্লাঙ্কটনের সংখ্যা সর্বাধিক। এরা যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারে, তা মাংসাশী মাছের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা থেকে অনেক বেশি। আবার দ্বিতীয় খাদ্যস্তরে মাছের শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষমতা শেষ খাদ্যস্তরের মাংসাশী প্রাণীর চেয়ে বেশি। সুতরাং দেখা যায়, শক্তির পিরামিড সবসময় সোজা আকৃতির হয়।

শক্তি প্রবাহ (Energy flow) : ইকোসিস্টেমের মধ্যদিয়ে সূর্য শক্তির একমুখী চলনকে শক্তি প্রবাহ বলে। সূর্য থেকে যে গতিশক্তি ইকোসিস্টেমে প্রবেশ করে তার একটি অতিক্ষুদ্র অংশ উদ্ভিদ কর্তৃক সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ধৃত হয় এবং গ্লুকোজের মতো বিভিন্ন জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে জমা হয়। কোষীয় শ্বসনের মাধ্যমে জৈব অণুগুলো ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয় যা শরীরে উত্তাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে খরচ হয় এবং শেষ পর্যন্ত নিম্নমানের শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে এ শক্তি শূন্যে (space) চলে যায়, জীবজগৎ এ শক্তি পুনরায় ব্যবহার করতে পারে না। কাজেই শক্তি প্রবাহ একমুখী (linear)। শক্তি প্রবাহিত হয় ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে। ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহ ঘটে খাদ্য শৃঙ্খলে (food chain)। যে গতিপথে খাদ্য একস্তর (trophic or feeding level) থেকে পরবর্তী স্তরে স্থানান্তরিত হয় সেই গতিপথকে **খাদ্য শৃঙ্খল বা ফুড চেইন** (food chain) বলে। খাদ্য শৃঙ্খলে শক্তি পর্যায়ক্রমে খাদ্যের মাধ্যমে এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তরিত হয়। **প্রডিউসার বা উৎপাদক** সূর্য শক্তিকে গ্রহণ করে খাদ্য শৃঙ্খল তথা ফুড চেইন-এর সূচনা করে। প্রকৃতিতে যেকোনো ইকোসিস্টেমে একাধিক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পর সংযুক্ত থাকে। পরস্পর একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের জটিল সংযোগ অবস্থাকে **ফুড ওয়েব** (food web) বা **খাদ্যজাল** বলে। শক্তি প্রবাহ নিম্নবর্ণিত তিনটি পর্যায়ভুক্ত। যথা—

১. শক্তি অর্জন : শক্তির মূল উৎস হলো সূর্যালোক। পৃথিবীতে যে পরিমাণ সূর্যালোক বিকিরিত হয় তার মাত্র ০.০২ ভাগ সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল কর্তৃক শোষিত হয় এবং রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উৎপন্ন খাদ্যের স্থিতিশক্তিরূপে আবদ্ধ থাকে। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আগত আলোক শক্তির ০.০১% মাত্র সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয়। সালোকসংশ্লেষণের সময় উৎপন্ন খাদ্যের মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি সংবন্ধন হয় তাকে **মোট উৎপাদন** (gross production) এবং শ্বসনে ব্যবহৃত হওয়ার পর যে শক্তি অবশিষ্ট থাকে তাকে **প্রকৃত উৎপাদন** (net production) বলে।

২. শক্তির ব্যবহার : প্রাইমারি খাদক প্রথম খাদ্যস্তরের অর্থাৎ উৎপাদকের প্রকৃত উৎপাদন শক্তি গ্রহণ করে থাকে। পরে তা সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি প্রভৃতি খাদকে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু শক্তি অর্জন কখনও ১০০ ভাগ হয় না। জীব যে পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে তার বেশির ভাগ দেহের তাপ উৎপাদন এবং নানাবিধ শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যয় হয়। এভাবে ব্যয়িত শক্তিকে **শ্বসন শক্তি** বলে।

৩. শক্তির স্থানান্তর : কোনো ইকোসিস্টেমে উৎপাদক থেকে শক্তি প্রথমে প্রাইমারি খাদকে, তা থেকে সেকেন্ডারি খাদকে এবং এভাবে টারশিয়ারি খাদক কিংবা সর্বোচ্চ খাদকে স্থানান্তরিত হয়। যেকোনো ফুড চেইনে শক্তির এ ধরনের স্থানান্তর দেখা যায়।

বিভিন্ন ধরনের পিরামিডের মধ্যে তুলনা

পার্থক্যের বিষয়	সংখ্যার পিরামিড	জীবভর পিরামিড	শক্তির পিরামিড
১। বিবেচিত বিষয়	সংখ্যার পিরামিড বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি খাদ্যস্তর জীবের সংখ্যা নির্দেশ করে।	জীবভরের পিরামিড বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি খাদ্যস্তরে মোট শুষ্ক ওজনকে বিবেচনা করা হয়।	শক্তির পিরামিডে বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি খাদ্যস্তরে শক্তির ব্যবহার ও হস্তান্তর বিবেচনা করা হয়।
২। তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	পুষ্টির প্রতিটি স্তরে জীবের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।	প্রতিটি স্তরের জীবসংখ্যার ওজন লিপিবদ্ধ করা হয়।	প্রতি স্তরে জীব শুকানো হয়। পরে তা পোড়ানো হয় এবং কিলোক্যালরি দিয়ে তাপ নির্ণয় করা হয়।
৩। সুবিধা	সহজেই গণনা করা যায়, কোনো জীবকে মারতে হয় না।	শীর্ষের দিকে ক্রমে আকার সরু থাকে।	রূপান্তরের দক্ষতা প্রদর্শন করে।
৪। অসুবিধা	জীবের আকার অগ্রাহ্য করে।	সকল জীবকে ধরা ও ওজন করা কঠিন।	সকল জীব থেকে তাপশক্তি বের করা কঠিন।
৫। গঠনাকৃতি	ত্রিকোণাকৃতির বা উল্টো আকৃতির পিরামিড হতে পারে।	ত্রিকোণাকৃতির বা উল্টো আকৃতির হয়।	সর্বদাই ত্রিকোণাকৃতির বা সোজা আকৃতির হয়।
৬। ব্যবহৃত একক	সংখ্যার পিরামিডে ব্যবহৃত একক জীবের সাধারণ সংখ্যা।	জীবভর পিরামিডে শুষ্ক ওজন প্রতি বর্গমিটারে গ্রাম বা gm/m^2 হিসেবে পরিমাপ করা হয়।	শক্তির পিরামিডে কিলোক্যালরি/বর্গমিটার/বছর হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

CamScanner

শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্য : ইকোসিস্টেমে শক্তি প্রবাহের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১। শক্তি প্রবাহ একমুখী।

২। শক্তির মূল উৎস সৌরশক্তি।

৩। সৌরশক্তি প্রথমে উৎপাদকের দেহে আহরিত হয় এবং পরে তা বিভিন্ন খাদকে স্থানান্তরিত হয়।

(i) সূর্য → (ii) উৎপাদক → (iii) খাদক (প্রাথমিক → সেকেন্ডারি → টারশিয়ারি)।

৪। খাদ্য শৃঙ্খলের শুরু থেকে যত শেষের দিকে যাওয়া যায় ততই শক্তির ক্রমব্যয় ঘটে।

৫। শক্তি প্রবাহে থার্মোডিনামিক্স (thermodynamics) এর ১ম ও ২য় সূত্র সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। প্রথম সূত্রানুযায়ী, শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না বরং এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী, শক্তির রূপান্তরের সময় রূপান্তরের প্রয়োজনে কিছু শক্তির অপচয় ঘটে।

শক্তি ইকোসিস্টেমে (খাদ্য হিসেবে) নিম্নরূপে প্রবাহিত হয় :

১। উৎপাদক (Producer) → ২। তৃণভোজী খাদক (Herbivores) → ৩। মাংসাশী খাদক (Carnivores)

শক্তি প্রবাহের দশমাংশ নিয়ম : খাদকরা যত উৎপাদককে ভক্ষণ করে তার **দশমাংশ মাত্র ব্যবহারকারীর (খাদকের)** দেহ গঠনের কাজে লাগে। যেমন— ১টি হরিণ যদি ১০০ কেজি তৃণ আহার করে তাহলে মাত্র ১০ কেজি তার দেহ গঠনে কাজে লাগে। ১টি বাঘ যদি হরিণের ১০ কেজি মাংস খায় তাহলে ঐ মাংসের মাত্র ১ কেজি বাঘের দেহ গঠনে কাজে লাগে। শক্তি প্রবাহ ব্যাখ্যায় এটি ১০ শতাংশ নিয়ম নামে পরিচিত। শতকরা ৯০ ভাগ শক্তি তাপ শক্তি হিসেবে পরিবেশে ফিরে যায়। **Lindenmann (1942) এ মতবাদের প্রবর্তক।** (চিত্র : ১২.৪ দ্রষ্টব্য)

বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন

পরিবেশ থেকে জীবদেহে বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ ও জমা হতে পারে। দেহে জমাকৃত বিষাক্ত পদার্থের ঘনত্ব নিম্নস্তরের জীবদের (যেমন-উৎপাদক) তুলনায় পরবর্তী স্তরের জীবদেহে অধিক থাকে। খাদ্য শৃঙ্খলে নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে অবস্থানরত জীবদেহে বিষের ক্রমবর্ধমান ঘনত্বের এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় **বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশন** (Biological Magnification)। আমেরিকাতে (১৯৫০ দশকে) ফসলে DDT প্রয়োগের বিষক্রিয়ায় ঈগল (খাদ্য শৃঙ্খলে সর্বোচ্চ স্তরে) প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। পরবর্তীতে সরকার DDT নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কাজ : সংখ্যার পিরামিড ও বায়োমাসের পিরামিড দুটির মধ্যে তুলনা কর। লক্ষ্য করো একটি অপরটির উল্টো। সংখ্যার পিরামিড ও শক্তির পিরামিড এর মিল খুঁজে দেখো। তোমার মতো করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করো।

জীবের অভিযোজন (Adaptation of organisms)

পরিবেশের সাথে জীবের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সব পরিবেশে সব ধরনের জীব বাস করতে পারে না। প্রতিটি জীব তখনই পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যখন সে তার সুবিধা অনুযায়ী একটি সুন্দর পরিবেশ পায়। **একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে কোনো জীবের খাপ খাইয়ে নেয়াটাই হলো ঐ জীবের অভিযোজন। কোনো নিবাসে বসবাসের জন্য একটি জীব যে বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে তাকে অভিযোজন বলে।** কতক জীব মিঠা পানিতে বাস করে, কতক জীব লোনা পানিতে বাস করে, কতক জীব মরুভূমিতে বাস করে, আবার কতক জীব স্বাভাবিক স্থলভাগে বাস করে। বাসস্থানে পানির প্রাপ্যতা ও ধরন এখানে একটি বড়ো নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পানিতে বাসকারী জীবের গঠন বৈশিষ্ট্য এক রকম, স্থলে বাসকারী জীবের গঠন বৈশিষ্ট্য অন্য রকম। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে বাসকারী জীবের গঠন ও আচরণ মরুভূমিতে বাসকারী জীবের গঠন ও আচরণ থেকে পৃথক ধরনের। কাজেই দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট পরিবেশীয় অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য (অভিযোজনের জন্য) ঐ পরিবেশে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়ের গঠনগত ও আচরণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ ঐ জীব সম্প্রদায়ের গঠনগত ও আচরণগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা ঐ বিশেষ পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। জলজ (জলজ), মরুময় (মরুজ) এবং লবণাক্ত পরিবেশে বাস করতে গিয়ে পরিবেশ অনুযায়ী জীব সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। **ওয়ার্মিং** (Warming-1909) মাটির প্রকৃতি ও মাধ্যমে পানির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদকে প্রধান

তিনটি প্রধান গ্রুপে ভাগ করেন; যেমন— হাইড্রোফাইট, জেরোফাইট এবং মেসোফাইট। লোনা পানির অঞ্চলে পানির লবণাক্ততার জন্য বিশেষ ধরনের লবণ সহনীয় উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। এরা হ্যালোফাইট বা লোনা মাটির উদ্ভিদ। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইটস (Hydrophytes)

জলে (পানিতে) যাদের জন্ম তারাই জলজ। যেসব উদ্ভিদ পানিতে জন্মে এবং পানিতে বিস্তার লাভ করে সেসব উদ্ভিদকে বলা হয় জলজ উদ্ভিদ বা হাইড্রোফাইট্স (গ্রিক *hydro* = পানি, *phyte* = উদ্ভিদ)। জলজ উদ্ভিদ পানিতে নিমজ্জিত, পানিতে ভাসমান বা উভচর হতে পারে। পানিতে জন্ম ও সফল বৃদ্ধির জন্য জলজ উদ্ভিদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

জলজ উদ্ভিদের প্রকারভেদ

বর্ণনা বা পাঠদানের সুবিধার জন্য জলজ উদ্ভিদসমূহকে তাদের সঠিক অবস্থা ও অবস্থানের ভিত্তিতে চার প্রকারে ভাগ করা হয়ে থাকে।

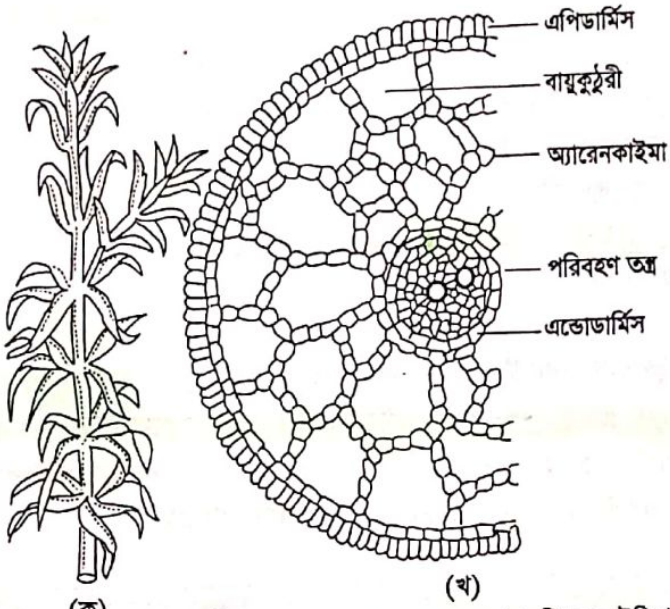

চিত্র ১২.৬ : *Hydrilla verticillata* (একটি জলজ উদ্ভিদ)
(ক) বাহ্যিক গঠন, (খ) কাণ্ডের অন্তর্গঠন।

১। **মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ (Rooted submerged hydrophytes)** : যেসব উদ্ভিদ মূল দ্বারা পানির নিচে মাটিতে আবদ্ধ থাকে এবং সমস্ত দেহটিই পানির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে সেসব উদ্ভিদকে মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ বলে। হাইড্রিলা (*Hydrilla verticillata*), পাতা শেওলা (*Vallisneria spiralis*), পাতা ঝাঁঝি (*Potamogeton nodosus*), সিরাটোফাইলাম (*Ceratophyllum demersum*), শ্যামা কলা (*ottelia*) ইত্যাদি নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ।

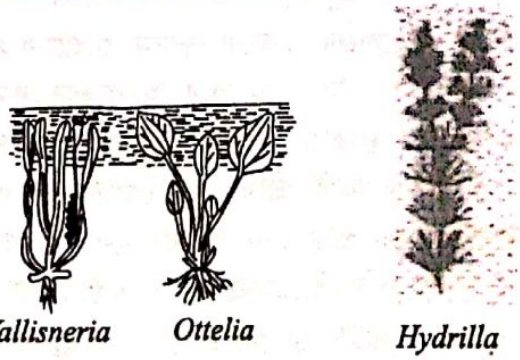

চিত্র ১২.৭ : কয়েকটি মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ।

২। **মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Free floating hydrophytes)** : জলাশয়ে পানির নিচে মাটির সাথে যেসব উদ্ভিদের কোনো সংযোগ থাকে না, ফলে পানির উপরিতলে মুক্তভাবে ভাসমান অবস্থায় বিরাজ করে তাদেরকে মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদ বলে। কচুরিপানা (*Eichhornia crassipes*), ক্ষুদিপানা (*Lemna minor*), গুঁড়িপানা (*Wolffia microscopica*),

টোপাপানা (*Pistia stratiotes*), কুতিপানা (*Azolla*), মুসাকানিপানা (*Salvinia*) এসব মুক্ত-ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ। *Utricularia rosettifolia* Alfasane et Hassan নামক একটি জলজ উদ্ভিদ বাংলাদেশ থেকে নতুন প্রজাতি জলজ উদ্ভিদ হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে।

চিত্র ১২.৮ : কয়েকটি ভাসমান জলজ উদ্ভিদ

৩। মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ (Rooted floating hydrophytes) : যেসব জলজ উদ্ভিদের মূল জলাশয়ের পানির নিচে মাটিতে সংযুক্ত থাকে কিন্তু দীর্ঘ বোঁটার কারণে পাতাগুলো পানির ওপরে ভাসমান থাকে তাদেরকে বলা হয় মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। সাদা শাপলা (*Nymphaea pubescens*), লাল শাপলা (*Nymphaea rubra*), নীল শাপলা (*Nymphaea nouchali*), পদ্ম (*Nelumbo nucifera*) কয়েকটি মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ।

৪। উভচর উদ্ভিদ (Amphibious plants) : যেসব উদ্ভিদ জলাশয়ের কিনারে মাটিতে শিকড়াবদ্ধ থাকে এবং কাণ্ডের অধিকাংশই পানিতে ভাসমান থাকে সেসব উদ্ভিদকে উভচর উদ্ভিদ বলে। কলমিলতা (*Ipomoea aquatica*), হেলেঞ্চা (*Enhydra fluctuans*), কেশরদাম (*Ludwigia repens*) কয়েকটি উভচর উদ্ভিদের উদাহরণ। হেলেঞ্চা মাটিতে আবদ্ধ উভচর, ভাসমান এবং স্থলজ হিসেবে জন্মাতে পারে।

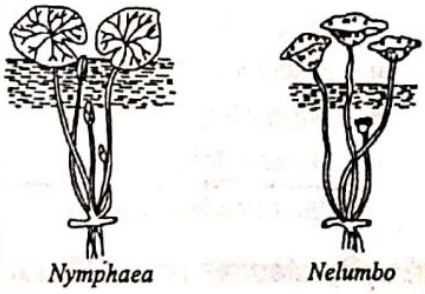

চিত্র ১২.৯ : মূলাবদ্ধ পত্র-ভাসমান জলজ উদ্ভিদ।

জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড নরম, দুর্বল, সরু ও লম্বা মধ্যপর্ব বিশিষ্ট হয়। মাটিতে নোঙ্গরাবদ্ধ ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় হয়।

২। জলজ উদ্ভিদের মূল সুগঠিত হয় না, অনেক ক্ষেত্রে মূল থাকে না বললেই চলে।

৩। কাণ্ড ও পাতার বহিঃত্বক কিউটিনযুক্ত থাকে না; পত্ররন্ধ্র থাকে না, বা কম থাকে। পত্ররন্ধ্রে প্রহরী (রক্ষীকোষ) কোষ নাও থাকতে পারে।

৪। এদের মূল ও কাণ্ডে বড়ো বড়ো বায়ুকুঠুরী থাকে। বায়ুকুঠুরী বিশিষ্ট গঠনকে অ্যারেনকাইমা বলে।

৫। জলজ উদ্ভিদের ভাস্কুলার বান্ডল অপেক্ষাকৃত ছোট থাকে, অনেক সময় জাইলেম অনুপস্থিত থাকে। মেকানিক্যাল টিস্যু খুবই কম থাকে, তাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খুব শক্ত হয় না।

৬। অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদে অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটে।

৭। যান্ত্রিক টিস্যু কম থাকে। এজন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃঢ় হয় না।

জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Hydrophytes)

অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন (Morphological adaptation)

১। মূল সুগঠিত হয় না, সংক্ষিপ্ত ও দুর্বল প্রকৃতির হয়। অনেক উদ্ভিদের (যেমন- গুঁড়িপানা = *Wolffia*) মূল থাকেই না।

২। মূলে মূলরোম অনুপস্থিত (কারণ পানি শোষণের জন্য মূলরোমের দরকার হয় না)।

৩। কোনো কোনো উদ্ভিদের অস্থানিক ভাসমান মূল (যেমন- কেশরদাম- *Jussiaea repens*) থাকে। ভাসমান মূল উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে।

৪। নিমজ্জিত উদ্ভিদের কাণ্ড নরম ও স্পঞ্জি হয়, মধ্যপর্ব লম্বা হয়। ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড অপেক্ষাকৃত খাটো ও মোটা হয়। মাটিতে আবদ্ধ উদ্ভিদের কাণ্ড সাধারণত রাইজোম জাতীয় ও নরম হয়।

৫। পাতা সাধারণত পাতলা ও নরম থাকে। তাই পানির টানে ছিঁড়ে যায় না। অনেক উদ্ভিদের পত্রবৃন্ত স্ফীত হয় যা উদ্ভিদকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। যেমন— কচুরিপানা।

৬। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদের পাতা আলোর জন্য ভেদ্য ও স্বচ্ছ।

৭। কখনো একই উদ্ভিদে বিভিন্ন ধরনের পাতার উপস্থিতি দেখা যায়। প্রজাতিভেদে পাতা বিভিন্ন আকৃতির হয়। কিছু উদ্ভিদের পাতা (আমাজান লিলি) এতো চওড়া যে একটি ছোট শিশুর ভর বহন করতে পারে।

অন্তর্গঠনগত অভিযোজন (Anatomical adaptation)

১। ত্বকে কিউটিকল থাকে না, অথবা খুবই পাতলা থাকে। কারণ পানির অপচয় রোধ করার প্রয়োজন হয় না।

২। নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ডের ত্বকে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে তাই সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

৩। কাণ্ড ও পাতার অভ্যন্তরে বড়ো বড়ো বায়ুকুঠুরী থাকে। বায়ুকুঠুরী বায়ু (O_2, CO_2) ধরে রাখে। বায়ুকুঠুরী উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে।

৪। মেকানিক্যাল টিস্যু থাকে না বা কম থাকে। তাই সহজে পানির টানে ভেঙ্গে যায় না।

৫। পরিবহণ টিস্যু থাকে না বা অগঠিত, কারণ পানি পরিবহণের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

৬। নিমজ্জিত উদ্ভিদের পাতায় স্টোম্যাটা থাকে না, অন্যান্য উদ্ভিদেও স্টোম্যাটা কম থাকে। কারণ, গ্যাস নিয়ন্ত্রণের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন (Physiological adaptation)

১। সব অঙ্গ দিয়েই পানি শোষণ করতে পারে (ত্বকে কিউটিকল না থাকায়), পানি শোষণের জন্য মূল ও মূলরোমের প্রয়োজন হয় না।

২। কাণ্ড ও পাতার ত্বকেও ক্লোরোফিল থাকে, তাই পানির নিচে কম আলোতে ও কম CO_2 যুক্ত পরিবেশে প্রয়োজনীয় সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে।

৩। অধিকাংশ জলজ উদ্ভিদ অঙ্গজ উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে (কারণ পরাগায়ন অনিশ্চিত)।

৪। কাণ্ড ও পাতার বায়ুকুঠুরীতে বায়ু জমা থাকায় শ্বসন ও সালোকসংশ্লেষণের অসুবিধা হয় না।

৫। প্রস্বেদন হার কম কারণ পানি শোষণের জন্য প্রস্বেদনের টান দরকার হয় না।

জলজ প্রাণীর অভিযোজন (Aquatic adaptation of animals)

জলজ প্রাণীরা জলে বাস করতেই বিশেষভাবে অভিযোজিত। জলজ প্রাণীদের মধ্যে অধিকাংশই হলো মাছের বিভিন্ন প্রজাতি। পানিতে থাকার সুবিধার জন্য এদের দেহের ভেতরে পটকা নামক বায়ু থলি থাকে। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ফুলকা থাকে। পানিতে চলাচলের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাখনা থাকে। দেহের আকৃতিও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া ব্যাঙ, কাছিম, কুমির, সাপ এগুলোও পানিতে বাস করতে পারে। এদের দেহের বিশেষ গড়ন, লোমহীন পুরু ত্বক, পা বা লেজ দিয়ে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা এবং পানির নিচে অক্সিজেন গ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

মরুজ উদ্ভিদ (Xerophytes)

মরু পরিবেশে অর্থাৎ বৃষ্টিপাতবিহীন শুষ্ক ও বালুকণাময় অঞ্চলে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় সেসব উদ্ভিদই মরুজ উদ্ভিদ। মরু অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত সাধারণত ২৫ সেমি (১০ ইঞ্চি)-র কম, তাই মাটিতে পানির পরিমাণও অনেক কম। অধিকাংশ মরু অঞ্চল কংকর ও বালিময়, মাটি প্রায় পানিশূন্য অবস্থায় থাকে, তারপরও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে তেমন প্রতিকূল পরিবেশেও কিছু উদ্ভিদকে জন্মাতে দেখা যায়। এসব উদ্ভিদ সাধারণ বৃষ্টিশূন্য খরা অঞ্চলেও সহজেই জন্মাতে পারে। আবার আমাদের দেশের মতো স্বাভাবিক পরিবেশেও জন্মাতে পারে। দেহে পানি সংরক্ষণ, অল্প আয়াসে মূল দিয়ে পানি শোষণ এবং

কাণ্ড বা পাতার মাধ্যমে পানির অপচয় রোধকরণ— এ তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের যেকোনো একটি বা সবকটি বৈশিষ্ট্যই একটি মরু উদ্ভিদে থাকতে পারে।

যেখানে পানির পরিমাণ কম কিন্তু প্রস্বেদনের হার বেশি সেখানে মরুজ উদ্ভিদ অধিক জন্মে। ওপেনাইমার (Oppenhelmer, 1960) মরুজ উদ্ভিদ বলতে সেসব উদ্ভিদকে বুঝিয়েছেন যারা আবাসস্থলে পানির অভাব মেটানোর জন্য নিজেদের বহির্গঠন, অন্তর্গঠন ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। মরুজ উদ্ভিদকে সাধারণত নিম্নলিখিত ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—

১। খরা এড়ানো উদ্ভিদ (Drought escaping plants)
২। কৌশলে খরা এড়ানো উদ্ভিদ (Drought evading plants)
৩। খরা সহ্যকারী উদ্ভিদ (Drought enduring plants)
৪। খরা প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ (Drought resistant plants)

মরুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। মূল বিস্তৃত অথবা মাটির গভীরে প্রসারিত থাকে।
২। কাণ্ড ও পাতা চ্যাপ্টা ও রসালো।
৩। পাতা অনেক ক্ষেত্রে কন্টক-এ রূপান্তরিত হয়, কোনো কোনো পাতা গুটানো ও ভাঁজ করা থাকে।
৪। কোষের আকার অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়, কোষপ্রাচীর পুরু ও কিউটিকল যুক্ত থাকে।
৫। কোষের প্যালিসেড প্যারেনকাইমা সুগঠিত ও বেশ দৃঢ়, কোষাবকাশ কম।

মরুজ উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptation of Xerophytes)

বাহ্যিক অভিযোজন

১। মরুজ উদ্ভিদসমূহ সাধারণত আকারে ছোটো ও ঝোপযুক্ত হয়। এ ধরনের উদ্ভিদ বালির ঝাপটা ও বায়ুর ঝাপটা সহ্য করতে পারে, তাই ভেঙ্গে যায় না।
২। মূল মাটির উপরিতলের কাছাকাছি অথবা খুবই গভীরে প্রলম্বিত। তাই ওপর থেকে সামান্য বৃষ্টির পানি যেমন শোষণ করতে পারে, দ্রুত মাটির গভীরে চলে যাওয়া পানিও শোষণ করতে পারে। অর্থাৎ এদের মূল সুগঠিত।
৩। অনেক উদ্ভিদের পাতা ও কাণ্ড চ্যাপ্টা, রসালো ও সবুজ থাকে। তাই পানি ধরে রাখতে পারে।
৪। পাতা অপেক্ষাকৃত ছোটো, পুরু বা কাঁটায় রূপান্তরিত। তাই পানির অপচয় রোধ হয়।

অন্তর্গঠনগত অভিযোজন

১। পাতার কিউটিকল পুরু, কাণ্ড ও পাতায় মোমের আবরণ থাকে। তাই প্রস্বেদন হ্রাস পায়।
২। পাতার প্যালিসেড প্যারেনকাইমা ঘন ও সুদৃঢ়, স্টোম্যাটা (পত্ররন্ধ্র) ত্বকের গভীরে (লুক্কায়িত) অবস্থিত, অনেক সময় লম্বা রোম দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তাই পানি বাষ্পায়ন ও নির্গমন কম হয়।
৩। প্যারেনকাইমা কোষ স্ফীতিশীল ও রসালো। তাই প্রয়োজনীয় পানি ধরে রাখতে পারে।
৪। এপিডার্মিস বহুস্তরবিশিষ্ট। তাই পানির অপচয় রোধ ও খরায় নেতিয়ে পড়ে না।
৫। কাণ্ডের মেকানিক্যাল টিস্যু ও পরিবহণ টিস্যু সুগঠিত, মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট ও ঘন সন্নিবেশিত। এটি পানির অপচয় রোধ, পানি ধরে রাখা এবং গাছকে খরাসহিষ্ণু করার কৌশল।

শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন

১। মরু উদ্ভিদের অভিস্রবণিক চাপ বেশি। তাই পানি শোষণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। পানি শোষণ সহজ হয়, পানি খরচ কম হয় এবং অপচয় রোধ হয়।
২। প্রস্বেদনের হার খুবই কম। তাই শোষিত পানির পরিমাণ কম হলেও তা দেহাভ্যন্তরে ধরে রাখতে পারে।
৩। বৃষ্টির সাথে সাথে পানি শোষণ করে নিতে সক্ষম।

CamScanner

৪। বর্ষজীবী উদ্ভিদসমূহ বৃষ্টির পরপরই অতি অল্প সময়ে জীবনচক্র সম্পন্ন করতে সক্ষম।

৫। কম পানি, অতি উত্তাপ ইত্যাদি কারণে এনজাইমের ক্রিয়া কিছুটা কম থাকে তাই অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ধীর গতি হয়।

৬। পাতার নিম্নত্বকে ভেতরের দিকে পত্ররন্ধ্র থাকে।

মরুজ উদ্ভিদের উদাহরণ : খেজুর (*Phoenix dactylifera*), শতমূলী (*Asparagus racemosus*), শতাব্দী উদ্ভিদ (*Agave americana*), আকন্দ (*Calotropis procera*), ঘৃতকুমারী (*Aloe vera*), করবী (*Nerium indicum*), ফণিমনসা (*Opuntia dillenii*), পাথরকুচি (*Bryophyllum*), ইউফরবিয়া (*Euphorbia*), বিভিন্ন ক্যাক্টাস প্রজাতি ইত্যাদি মরু উদ্ভিদের কতিপয় উদাহরণ। এর সবকটিই বাংলাদেশে স্বাভাবিক পরিবেশে জন্মে থাকে।

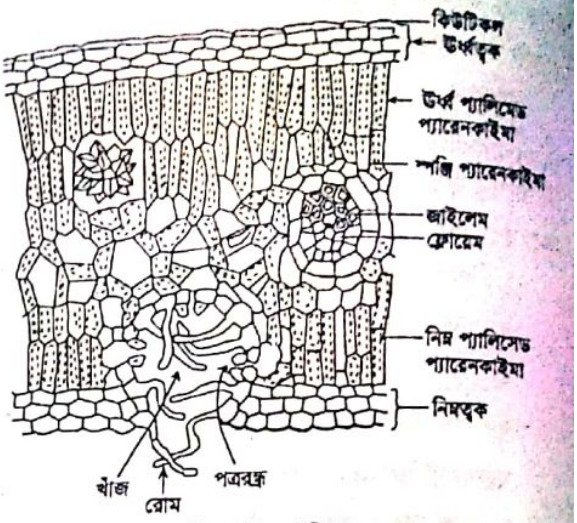

চিত্র ১২.১০ : *Nerium* (করবী- একটি মরু উদ্ভিদ) পত্রের প্রস্থচ্ছেদ।

মরুজ প্রাণীর অভিযোজন

মরুজ পরিবেশ চরমভাবাপন্ন। এখানে খুব কম সংখ্যক প্রাণী প্রজাতিই বাস করে। তীব্র আলো, উচ্চতাপ, উষ্ণ বালি-পাথর এবং স্বল্পপানি—এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা। উট, সাপ, বিশেষ ধরনের ইঁদুর, মরু গিরগিটি, পাখি, মরু বিড়াল ইত্যাদি প্রাণী মরু অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।

এদের অনেকেই দিনের বেলায় গর্তে লুকানো থাকে এবং রাত্রিতে বাইরে বের হয়। এরা অধিকাংশই দ্রুতগামী। মরুবাসী প্রাণী দীর্ঘদিন পানি পান না করে থাকতে পারে। এদের অধিকাংশই রসালো খাদ্যে বিদ্যমান পানি দ্বারা পানির অভাব পূরণ করে। এদের অনেকের গায়ের ত্বক পুরু থাকে যাতে পানির অপচয় কম হয় এবং তাপ সহ্য করতে পারে। মরু ঝড়ের বালি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এদের অনেকের নাকের ছিদ্র অত্যন্ত সরু থাকে, কানের ছিদ্র আঁইশ বা লোমাবৃত থাকে। চোখ ঢেকে রাখার আবরণ থাকে, অনেকের পায়ের তলায়ও বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। দিনের কড়া তাপ এড়ানোর জন্য অধিকাংশ প্রাণী নিশাচর প্রকৃতির হয়। উটের দেহাভ্যন্তরে পানি জমা করে রাখার ব্যবস্থা আছে। অনেকে গাছের কচি পাতা ও বাকল চিবিয়ে পানির অভাব পূরণ করে।

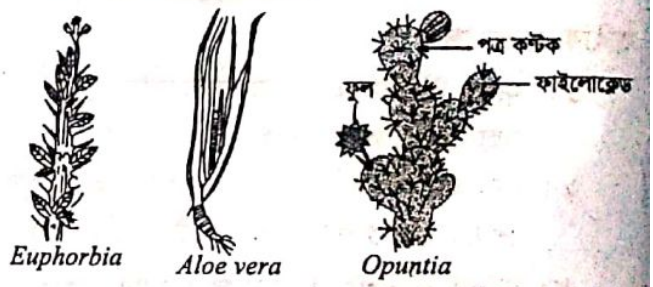

চিত্র ১২.১১ : কয়েকটি মরুজ উদ্ভিদ

লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট (Halophytes)

লোনা পরিবেশে অধিকাংশ উদ্ভিদই জন্মাতে পারে না, তবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কতিপয় উদ্ভিদ প্রজাতি জন্মাতে পারে। **যেসব উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশে** (মাটিতে ও পানিতে) **সহজেই জন্মাতে ও বিস্তার লাভ করতে পারে সেসব উদ্ভিদই লোনামাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট** (Halophytes)। এ ধরনের আবাসে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ ($NaCl$, $MgCl$, $MgSO_4$) বেশি থাকায় সাধারণ উদ্ভিদ সেখান থেকে পানি শোষণ করতে পারে না। তাই সেখানে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। সমুদ্র উপকূলবর্তী জোয়ারভাঁটা অঞ্চলে যে বিশেষ ধরনের হ্যালোফাইট জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে সেসব উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ (mangrove) বলে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যথা- সুন্দরবনে এ জাতীয় উদ্ভিদ পাওয়া যায়।

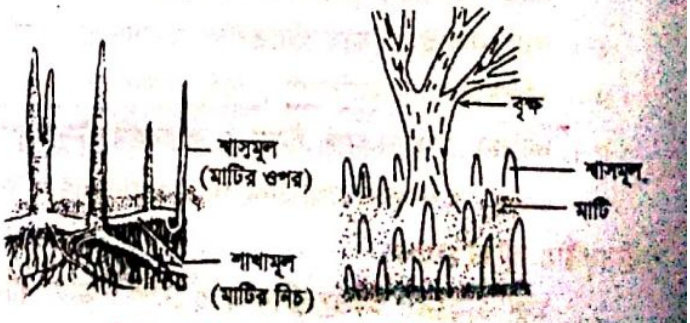

চিত্র ১২.১২ : লোনামাটির উদ্ভিদের শ্বাসমূল

লোনামাটির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। লোনামাটির উদ্ভিদের কাণ্ড ও পাতা রসালো থাকে।
২। এদের স্তম্ভমূল বা ঠেসমূল থাকে যা মাটির সামান্য নিচে বিস্তৃত থাকে।
৩। মাটিতে O_2 কম থাকায় অনেক উদ্ভিদে শ্বাসমূল বা নিউমেটোফোর (pneumatophore or breathing root) সৃষ্টি হয়। মাটির নিচের শাখা মূল থেকে শ্বাসমূল মাটির উপরে উঠে আসে। এদের গায়ে শ্বাসছিদ্র থাকে, যা দিয়ে বায়ু থেকে O_2 গ্রহণ করে।
৪। মূলের অভ্যন্তরে (কর্টেক্স-এ) বড় বড় বায়ুকুঠুরী থাকে।
৫। লোনামাটির উদ্ভিদে প্রস্বেদন কম হয়।
৬। অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (viviparous germination) হয়, যেমন— *Rhizophora* গণের প্রজাতি।
৭। এদের কোষস্থ প্রোটোপ্লাজম কিছুটা আঠালো হয় এবং এদের অভিস্রাবণিক চাপ বেশি থাকে।
৮। উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত খর্বাকার হয় এবং এদের এপিডার্মিস বহুস্তর বিশিষ্ট হয়।

লবণাক্ত পরিবেশে উদ্ভিদের অভিযোজন (Adaptaion of Halophytes)

১। মাটির গভীরতার সাথে সাথে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পায়, তাই অধিকাংশ উদ্ভিদের মূলতন্ত্র মাটির খুব গভীরে না গিয়ে মাটির উপরের স্তরেই বিস্তৃত থাকে।

২। অধিক লবণাক্ত পানি শোষণ করতে অসুবিধা হয়, তাই বৃষ্টির সময় লবণাক্ততা কিছুটা কমে আসলে উদ্ভিদ দ্রুত পানি শোষণ করে তাদের প্যারেনকাইমা কোষে সঞ্চয় করে রাখে। এ কারণে এদের কাণ্ড, পাতা ও মূলকে কিছুটা রসালো দেখায়।

৩। জোয়ার-ভাটার সময় পানির টানকে সহ্য করে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেক উদ্ভিদে স্তম্ভমূল বা ঠেসমূল থাকে।

৪। শ্বাসমূলের ভেতরে বায়ুকুঠুরী থাকে এবং সে কুঠুরীতে বায়ু (O_2) ধরে রাখতে পারে। শ্বাসমূলের কারণে মূল ও বাইরের সাথে গ্যাসের বিনিময় সহজ হয়।

৫। লবণাক্ত মাটিতে এবং জোয়ার-ভাটার স্থানে বীজ এক স্থানে টিকে থাকা কঠিন। তাই বহু উদ্ভিদে গাছে থাকা অবস্থায়ই বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হয়ে লম্বা ভ্রূণমূল সৃষ্টি হয়। মূল একটু বড় ও ভারী হলে মাটিতে পড়ে এবং কিছুটা কাদা মাটিতে ঢুকে যায় ও স্থায়ী হয়। ফলে জোয়ার-ভাঁটার টানে তা ভেসে যায় না। উদ্ভিদে থাকা অবস্থায় ফলের অভ্যন্তরে বীজের অঙ্কুরোদগমকে বলা হয় জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম (Viviparous germination)। ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র ১২.১৩ : *Rhizophora* উদ্ভিদের জরায়ুজ অংকুরোদগম।

আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠালে মৌসুমের শেষ দিকে ফলের ভেতরেই বহু বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মূলতন্ত্র প্রকাশ করে কিন্তু ফলের বাইরে চলে আসে না। এরূপ অবস্থাকে ক্রিপ্টো ভিভিপ্যারি বলা যায়।

৬। শ্বাসমূলের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

৭। যথেষ্ট পরিমাণ পানি শোষণ করতে পারে না বলে প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রিত থাকে।

লবণাক্ত উদ্ভিদের উদাহরণ : গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), গরান (*Ceriops roxburghii*), কাঁকড়া (*Bruguiera gymnorrhiza*) এবং বাইন (*Avicennia officinalis*), বোরা (*Rhizophora conjugata*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), পশুর (*Zylocarpus moluccensis*), গোলপাতা (*Nipa fruticans*), হারগোজা (*Acanthus illicifolius*), সুন্দরি (*Heritiera fomes*)।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ (Mangrove Vegetation) : যেসব লোনামাটির উদ্ভিদ স্থায়িভাবে অগভীর লবণাক্ত পানিতে বা কম লবণাক্ত পানিতে অথবা জোয়ারের সময় লবণাক্ত হয় এমন পানিতে উৎপন্ন হয় সেসব উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে।

ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের আবাসস্থলের মাটি সর্বদাই কর্দমাক্ত থাকে। এসব উদ্ভিদের পাতা মসৃণ ও চকচকে থাকে। কাণ্ডের নিম্নভাগ থেকে ঠেসমূল উৎপন্ন হয় যার মাধ্যমে কর্দমাক্ত নরম মাটিতে দৃঢ়ভাবে সোজা থাকে। উদ্ভিদের গোড়ার অংশ পানিতে থাকার ফলে মূল ঠিক মতো O_2 গ্রহণ করতে পারে না। তাই অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বিশেষ এক ধরনের মূল মাটি ভেদ করে উল্টোদিকে প্রসারিত হয়ে পানির ওপর ওঠে আসে। এগুলোর নাম হচ্ছে— **নিউম্যাটোফোর বা শ্বাসমূল**। ছিদ্রের সাহায্যে O_2 গ্রহণ এবং শ্বসন চালু রাখে। ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বীজের **জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম**। এ অঙ্কুরোদগমে ফল গাছে ঝুলে থাকা অবস্থায়ই বীজ অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ করে। গাছ থেকে ফল বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই বীজের ভেতরের ভ্রূণমূল ফলের প্রাচীর ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বর্ধিত হয়। ভ্রূণমূল ক্রমান্বয়ে স্ফীত হয়ে গদাকার ধারণ করে এবং ওজনেও বাড়ে ফলে, ভ্রূণমূলের ভারে অঙ্কুরিত বীজ ফল থেকে খসে খাড়াভাবে নিচে পড়ে যায় এবং কর্দমাক্ত নরম মাটিতে প্রোথিত হয়। এরপর মূল নির্গত হয় এবং চারা মাটির সঙ্গে আটকে যায়। এভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়। সুন্দরবনে যেসব প্রজাতি পাওয়া যায় তার মধ্যে সুন্দরি, গরান, গেওয়া, পশুর, গোলপাতা, হারগোজা, কেওড়া, কাঁকড়া অন্যতম।

লবণাক্ত পরিবেশে প্রাণীর অভিযোজন

লবণাক্ত পরিবেশ বলতে এখানে সুন্দরবনের পরিবেশকে ধরে নেয়া হয়েছে, বিশাল সমুদ্রকে নয়। এখানে আছে অসংখ্য প্রজাতির মাছ, পাখি, সাপ, হরিণ, বাঘ, বানর, বনমোরগ, শুকর, কাছিম, কাঁকড়া ইত্যাদি। লোনা পানিতে যেসব মাছ বাস করে তারা লোনা পানি গ্রহণ ও ত্যাগ করতে পারে। স্তন্যপায়ীরাও অধিক সময় পানির নিচে থাকতে পারে এবং পানির উপরিতলে এসে শ্বাস নেয়। সুন্দরবনের অন্যান্য প্রায় সব প্রাণীই প্রচুর খাদ্য প্রাপ্তির উপর অভিযোজিত। এরা খাদ্যের অভাব হলে স্থান ত্যাগ করতে পারে। কাছিম ডাঙ্গায় এসে বালির গর্তে ডিম পাড়ে। পানিতে সাঁতার কাটতে এরা অভিযোজিত।

মেসোফাইট (Mesophytes)

যে মাটিতে মিষ্টি পানি (লোনা পানি নয়) প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক মাত্রায় (কম বা অধিক নয়) থাকে সে মাটিতে জন্মানো উদ্ভিদই হলো **মেসোফাইট** (Mesophyte)। আমাদের অধিকাংশ ফলদ বৃক্ষ, ফসল উদ্ভিদ, বাড়ির আশপাশের ঝোপ, রাস্তার ধারের আগাছা হলো মেসোফাইট। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, শাল, সেগুন এসব মেসোফাইটের উদাহরণ।

কাজ : একটি ছকের মাধ্যমে জলজ, মরুজ ও লবণাক্ত পরিবেশে জন্মানো উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলনা করে দেখাও। তুলনা করার আগে বিষয়টি বার বার ভালোভাবে পড় এবং বুঝে নাও। মাটিতে পানির পরিমাণ, লবণাক্ততা, মূলের গঠন, কাণ্ডের অভ্যন্তরীণ গঠন, স্টোম্যাটা, জনন ইত্যাদি বিষয়ে তুলনা কর।

[বি. দ্র. উদ্ভিদ নিশ্চল, প্রাণী সচল এবং প্রয়োজনে স্থান ত্যাগ করতে পারে। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভিযোজন একই রকম নয়।]

জলজ, মরুজ ও লোনামাটির উদ্ভিদের মধ্যে তুলনা

বৈশিষ্ট্য	জলজ উদ্ভিদ	মরুজ উদ্ভিদ	লোনামাটির উদ্ভিদ
১. মূল	মূল সুগঠিত নয়।	মূল সুগঠিত এবং মাটির উপরিতল অথবা নিচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।	মূল সুগঠিত।
২. কাণ্ড	কাণ্ড নরম হয়। অভ্যন্তরে বাতাবকাশ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে।	কাণ্ড শক্ত হয়। বাতাবকাশ খুবই কম থাকে।	কাণ্ড শক্ত বা নরম হতে পারে। বাতাবকাশ তেমন থাকে না।
৩. পাতার আকার	পাতা বড় ও নরম হয়।	পাতা ক্ষুদ্রাকৃতির।	পাতা ক্ষুদ্র ও স্ফীত হতে পারে।
৪. কিউটিকল	নিমজ্জিত পাতায় কিউটিকল থাকে না। বায়বীয় অংশ ও ভাসমান পাতায় পাতলা কিউটিকলের স্তর থাকে।	কাণ্ড ও পাতার ত্বকে কিউটিকলের মোটা স্তর থাকে।	কাণ্ড ও পাতার উপরিভাগে পুরু কিউটিন স্তর থাকে।
৫. মোম	নিমজ্জিত অংশে মোমজাতীয় কোনো পদার্থ থাকে না।	পাতার উপর পৃষ্ঠ ও রূপান্তরিত কাণ্ডের পৃষ্ঠ মোমাবৃত থাকে।	পাতা ও কাণ্ডের উপর পৃষ্ঠে পুরু মোমাবৃত থাকে।
৬. পত্ররন্ধ্র	নিমজ্জিত অংশে পত্ররন্ধ্র নেই।	পাতার নিম্নপৃষ্ঠ ও কাণ্ডে লুক্কায়িত পত্ররন্ধ্র থাকে।	পত্ররন্ধ্র ক্ষুদ্র ও স্বল্পসংখ্যক।
৭. পরিবহণ টিস্যু	পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ ক্ষীণ ও দুর্বল।	পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ সুগঠিত।	পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ সুগঠিত।

জীবভূমি বা বায়োম (Biome)

একটি বড়ো বাস্তুতন্ত্র তথা ইকোসিস্টেমই একটি বায়োম। তুন্দ্রা অঞ্চল একটি বায়োম, মরুভূমি একটি বায়োম, ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট একটি বায়োম। একই ধরনের জলবায়ু, একই ধরনের মাটি, একই জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত একটি বৃহৎ ও পৃথকযোগ্য ইকোসিস্টেমকে বলা হয় বায়োম। প্রধানত ভূমিরূপ, জলবায়ু ও প্রধান ভেজিটেশন (উদ্ভিজ্জ) মিলিতভাবে এক একটি বায়োম সুনির্দিষ্ট করে। সারা বিশ্বে অনেক বায়োম আছে। বায়োম প্রধানত দুভাগে বিভক্ত– ১। স্থলজ বায়োম ও ২। জলজ বায়োম। নিচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

১। স্থলজ বায়োম (Terrestrial biome) : যেসব বায়োম স্থলভাগে অবস্থিত তাদের স্থলজ বায়োম বলে। স্থলজ বায়োম প্রধানত নিম্নরূপ :

(ক) মরুভূমি বায়োম (Desert biome) : মরুভূমি হলো এমন ভৌগোলিক অঞ্চল যেখানে বাৎসরিত বৃষ্টিপাত ২৫ সেমি (১০ ইঞ্চি)-এর কম। এখানে বাষ্পায়ন হার অনেক বেশি। এখানে জলীয় বাষ্প থাকে না। মাটিতে জৈব পুষ্টি খুব কম। মাটিতে পুষ্টি থাকলেও পানির খুব অভাব থাকে।

এ ধরনের মরুভূমি উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের 30° ল্যাটিচুডে অবস্থিত। সব মরুভূমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত নয়। সবচেয়ে বড়ো মরুভূমি সাহারা, যা আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় অর্ধেক স্থান জুড়ে অবস্থিত। অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় মরুভূমি আছে। মরুভূমিতে দিন ও রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য 30°C পর্যন্ত হতে পারে। মরুভূমিতে অভিযোজিত উদ্ভিদকে জেরোফাইট বলা হয়। মরুভূমিতে বর্ষজীবী ও বহুবর্ষজীবী উভয় প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। সাধারণত বছরে একবারই বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির সাথে সাথেই আগের বছরের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং খুব অল্প দিনেই বিকশিত হয়ে ফুলে-ফলে ভরে যায়। সংক্ষিপ্ত জীবন শেষে এরা মরেও যায়। মরুভূমির উদ্ভিদের স্টোম্যাটা সাধারণত রাত্রিতে খোলে, তাই পানির অপচয় হয় না। এরা অধিকাংশই CAM উদ্ভিদ। ক্যাকটাস, বাবলা, খেজুর, কিছু ইউফরবিয়া, কিছু লিগিউম এবং অ্যাস্টারেসির কিছু উদ্ভিদ জন্মে থাকে। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উট, দুম্বা, ক্যাঙ্গারু, র‍্যাবিট, খেকশিয়াল প্রধান। সরীসৃপের মধ্যে হর্ণ লিজার্ড, কোরাল সাপ, গিলা মনস্টার ইত্যাদি। পাখিদের মধ্যে শকুন, দাড়কাক, মধু পাখি উল্লেখযোগ্য। প্রাণীরা সাধারণত রাত্রে বেশি চলাফেরা করে।

(খ) তৃণভূমির বায়োম (Grassland biome) : এ বায়োমে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২৫–৭৫ সেমি (১০–৩০ ইঞ্চি), সাধারণত বছরে এক মৌসুমেই বৃষ্টিপাত হয়। ঘাস হলো তৃণভূমি বায়োমের প্রধান ভেজিটেশন। মধ্য কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়াতে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি আছে। তৃণভূমি নানাবিধ তৃণভোজী প্রাণীর চারণ ক্ষেত্র। ঘাসের পাতা সরু এবং খাড়াভাবে থাকে, তাই প্রস্বেদন কম হয়। মাটি হিউমাস সমৃদ্ধ। দিনে ও রাতে তাপমাত্রা কম-বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। শীতকালে তাপমাত্রা 15°C এ নেমে যায় আর গ্রীষ্মকালে 32°C এর ওপরে ওঠে আসে। বড়ো ঘাস ১২-১৫ সে.মি. লম্বা হয়। যব, গম, রাই বেশি জন্মে। প্রধান প্রধান তৃণভোজী প্রাণী হলো বাইসন, জেব্রা, জিরাফ, ঘোড়া, এন্টিলোপ, ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি। এদের ভক্ষক হলো সিংহ, হায়না ও খেকশিয়াল। কীটপতঙ্গের মধ্যে উঁইপোকা, ঘাসফড়িং, মৌমাছি, প্রজাপতি এবং এদের খাদক হিসেবে পাখি, টিকটিকি, সাপ ও ব্যাঙ বাস করে।

(গ) সাভানা বায়োম (Savanna biome) : এ বায়োমে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ১০০–১৫০ সেমি (৪০–৬০ ইঞ্চি)। সাভানা এক বিশেষ ধরনের তৃণভূমি, মাঝে মাঝে ছোটো বৃক্ষ বা ঝোপ থাকে, যা তৃণভূমিতে থাকে না। সাভানাতে দীর্ঘ শুকনো মৌসুম থাকে। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের সীমানায় সাভানা সৃষ্টি হয়েছে। আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়াতে সাভানা আছে।

(ঘ) তুন্দ্রা বায়োম (Tundra biome) : সবচেয়ে উত্তরের স্থল ভাগের বায়োম হলো তুন্দ্রা। সাইবেরিয়ার উত্তরাংশ, গ্রিনল্যান্ড, আলাস্কা ও উত্তর মেরু অঞ্চল নিয়ে তুন্দ্রা বায়োম গঠিত। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কখনো ১৫ সেমি (৫ ইঞ্চি) বা তারও কম, যা বরফ হিসেবে পড়ে। দীর্ঘ শীতকালে এখানে বরফ জমা হয়ে থাকে। ছয় থেকে আট সপ্তাহের গ্রীষ্মকাল দেখা যায় যখন ওপরের কিছু বরফ গলে যায় এবং ছোটো ছোটো জলাভূমি সৃষ্টি হয়। এখানে সূর্যের আলো তির্যকভাবে পড়ে। মৃত জীবদেহ পুষ্টির প্রধান উৎস, যা নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সমৃদ্ধ।

তুন্দ্রা অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ মস ও লাইকেন। এখানে বৃক্ষ প্রজাতি কম। উঁচু পর্বতশৃঙ্গে এরূপ অঞ্চল আছে, যাকে আলপাইন তুন্দ্রা বলে। স্তন্যপায়ীর মধ্যে বলগা হরিণ, খরগোস, নেকড়ে, মেরুভাল্লুক প্রধান। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন,

বাজপাখি, হাঁস, পেঁচা, স্যান্ড পাইপার প্রধান। গ্রীষ্মকালে কিছু মশা ও মাছির আগমন ঘটে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে শামুক, জোঁক, জলজ বিটল উল্লেখযোগ্য।

(ঙ) বনভূমির বায়োম (Forestland biome) : পৃথিবীপৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি দিয়ে আবৃত থাকে। এটা বৃষ্টিপাত প্রবণ এলাকা হওয়ায় প্রধান জীবগোষ্ঠী হলো বৃক্ষ এবং কাষ্ঠল উদ্ভিজ্জ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের বনভূমি দেখা যায়। বনভূমি বায়োম বিভিন্ন ধরনের :

(i) ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট (Tropical rain forest) : বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ২৫০ সেমি থেকে ৪৫০ সেমি (১০০ ইঞ্চি থেকে ১৮০ ইঞ্চি)। বৃষ্টিপাত প্রায় সারা বছরই হয়, তবে বর্ষাকালে অধিক। সবচেয়ে বড়ো ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান রেইন ফরেস্ট, এর আয়তন ৭০,০০,০০০ বর্গকিলোমিটার, এতে আছে ১৬,০০০ প্রজাতির ৩৯০ বিলিয়ন বৃক্ষ। এর ৬০% ব্রাজিলে অবস্থিত। বাকি অংশ পেরু, বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম প্রভৃতি দেশে অবস্থিত। আমাজান রেইন ফরেস্টকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস। সমগ্র বিশ্বের মোট উৎপাদনের ২০% অক্সিজেন এ বনে নির্গত হয়। দ্বিতীয় বৃহত্তম ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, এরপর আফ্রিকার কঙ্গো অববাহিকা, ভারত, বার্মা, মধ্য আমেরিকা এবং ফিলিপাইনের অংশবিশেষে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট অবস্থিত।

ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে অসংখ্য প্রজাতির উঁচু বৃক্ষ জন্মে। বনের মেঝে (floor) অন্ধকার ও ভেজা থাকে। এসব বনে কোনো একক প্রজাতির উদ্ভিদ আধিপত্য বিস্তার করে না। বনের ওপরে ক্যানোপি (canopy) তৈরি হয় ৩০-৪৫ মিটার উঁচু বৃক্ষের প্রজাতি দিয়ে। কিছু উঁচু বৃক্ষ (৬০ মিটার বা বেশি) এ ক্যানোপি ভেদ করে ওপরে ওঠে যায়, যাদেরকে **ইমার্জেন্ট** (emergent) বলে। বৃক্ষকে অবলম্বন করে প্রচুর কাষ্ঠল লতা ও পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টে স্পিশিস ডাইভারসিটি অধিক। এ সব ফরেস্টে অসংখ্য প্রজাতির পতঙ্গ, পাখি, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী ও উভচর প্রাণী বাস করে।

(ii) ট্রপিক্যাল সিজনাল ফরেস্ট (Tropical seasonal forest) : ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট অঞ্চল থেকে এখানে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত কিছুটা কম, তবে এখানকার বৃষ্টিপাত সারাবছর না হয়ে বিশেষ মৌসুমে (বর্ষাকালে) হয়ে থাকে। মৌসুমি বৃষ্টিপাতের সময় এ বন ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্টের মতোই, শীতকালে কিছু বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটের বন কতকটা এ জাতীয়। বার্মার (মিয়ানমার) সেগুন বন এ জাতীয়।

(iii) পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest) : ডেসিডুয়াস ফরেস্টে বৃক্ষের পাতা বছরে একবার (বিশেষত শীতকালে বা শুকনো মৌসুমে) ঝরে যায়। ডেসিডুয়াস ফরেস্ট আবার দু'ধরনের, টেম্পারেট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট এবং ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট। নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(a) টেম্পারেট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট : এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ১০০ সেমি (৩৯ ইঞ্চি), কিন্তু তাপমাত্রা কম। শীতকালে সব বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। উঁচু বৃক্ষের মধ্যে ওক (Oak), ম্যাপল (maple), বীচ (Beech), বার্চ (Birch), চেস্টনাট প্রধান। আমেরিকা (পূর্ব দিক), কানাডা (উত্তর-দক্ষিণ দিক) ইউরোপ (মধ্য ও উত্তর ব্রিটেন, নরওয়ে, সুইডেন), রাশিয়া, পূর্ব এশিয়া, চায়না, কোরিয়া ইত্যাদি দেশে এ বন আছে। এ অঞ্চলে তুষারপাত হয়।

(b) ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট : এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত বেশি (২০০ সেমি, ৭০–৭৫ ইঞ্চি); শীত অপেক্ষাকৃত কম, বরফ পড়ে না। এ বনের অধিকাংশ বৃক্ষই পত্রঝরা। শাল, কড়ই, চালতা, কুম্ভি, কুরচি ইত্যাদি এ বনের প্রধান বৃক্ষ। বাংলাদেশের শালবন ময়েস্ট ডেসিডুয়াস ফরেস্ট।

(iv) কনিফার ফরেস্ট (Conifer forest) : এ অঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ৫০–১০০ সেমি (২০–৪০ ইঞ্চি); দীর্ঘ শীতকাল ও সংক্ষিপ্ত গ্রীষ্মকাল থাকে। তাপমাত্রা –30°C থেকে 30°C, মাটি উর্বর এবং লিটার সমৃদ্ধ তাই অম্লীয়। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কনিফার ফরেস্ট আছে। প্রধান বৃক্ষ পাইন, স্প্রুস, ফার, রেডউড, হেমলক ইত্যাদি। এদের অধিকাংশই চিরসবুজ। প্রাণীর মধ্যে শিয়াল, নেকড়ে, সিংহ, হরিণ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, কাঠবিড়ালী, ইঁদুর এবং অসংখ্য পোকামাকড় এখানে জন্মে। সামান্য কিছু সরীসৃপ প্রাণীও আছে।

(v) ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (Mangrove forest) : এ ধরনের বনাঞ্চল ৩২° উত্তর এবং ৩০° দক্ষিণ এর মধ্যবর্তী উপকূলীয় গড়ান অঞ্চলে (intertidal zone) জন্মে। বাংলাদেশের সুন্দরবন-এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ধরনের বন আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া এবং উত্তর অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে আছে। প্রাত্যহিক জোয়ার-ভাটার কারণে সিক্ত, কর্দমাক্ত এবং লবণাক্ত হয়। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৬০–২০০ সেমি। এজন্য বনভূমি তেমন সমৃদ্ধ নয়। এ পরিবেশে বিশেষ ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদ লক্ষ্য করা যায় (যেমন-শ্বাসমূল, জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম, স্তম্ভমূল ও ঠেস

উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরী, কেওড়া, গরান, গেওয়া, হিজল, গোলপাতা, বাইন, বোরা ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া কেয়া, টাইগার ফার্ন, বিভিন্ন ধরনের আরোহী লতা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখযোগ্য প্রাণীগুলো হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতা বাঘ, চিত্রা হরিণ, কুমীর, বন্য শূকর, বানর, নানা ধরনের শামুক, সাপ ও পাখি।

২। **জলজ বায়োম (Aquatic biome) :** পৃথিবীপৃষ্ঠে জলময় পরিবেশের বায়োমগুলো একত্রে জলজ বায়োম নামে পরিচিত। জলজ বায়োম মিঠা পানি এবং সাগরে পৃথক প্রকৃতির। মিঠাপানির বায়োম নদী, হ্রদ, হাওর, বাঁওড়, জলাভূমি (wetlands) ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত। ম্যানগ্রোভস্ (mangroves) বনাঞ্চল ওয়েটল্যান্ড বায়োমের অন্তর্গত। ম্যানগ্রোভস্ ৩২° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ ল্যাটিচুডের মাঝামাঝি উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

জলজ বায়োম প্রধানত দু'প্রকার। মিঠাপানির (স্বাদু পানির) ও লোনাপানির বায়োম।

(ক) মিঠাপানি বা স্বাদু পানির বায়োম (Freshwater biome) : পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মিঠাপানির বায়োম দিয়ে আবৃত। এগুলো ছোটো, অগভীর এবং বিচ্ছিন্ন। এগুলো কয়েক ধরনের।

(i) নদী (River) : নদীতে সাধারণত একমুখী স্রোত থাকে। ঝর্ণা, হ্রদ বা হিমবাহ থেকে নদীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। নদীর উৎসে প্রচুর পরিমাণে নুড়ি পাথর থাকে। সেখানে পানির স্রোত বেশি থাকে। তাপমাত্রা কম থাকে। পানি স্বচ্ছ এবং প্রচুর O_2 থাকে। মাঝামাঝি সমতল অংশ বেশ চওড়া এবং শেষ দিকে পানিতে প্রচুর পলিমাটি থাকায় পানি ঘোলাটে হয়। মাঝামাঝি সমতল অংশে প্রচুর শৈবাল এবং সবুজ উদ্ভিদ জন্মে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে নানা ধরনের মাছ প্রধান, সরীসৃপের মধ্যে কুমির, ঘড়িয়াল, সাপ, কাছিম আর স্তন্যপায়ীর মধ্যে শুশুক।

(ii) জলাভূমি (Wetlands) : রামসার কনভেনশন (১৯৭১) অনুসারে বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত জলাভূমি সুন্দরবন ও টাঙ্গুয়ার হাওর। এছাড়া সারাদেশে ছোটো-বড়ো অনেক জলাভূমি আছে। এগুলো স্থায়ী বা অস্থায়ী, মিঠাপানি বা লোনা পানির জলাধার, এদের স্রোত বা বদ্ধ জলাশয় থাকে। সারা বিশ্বের জলাভূমিতে ৫০০০ এর বেশি সপুষ্পক উদ্ভিদ জন্মে থাকে। বাংলাদেশে এর সংখ্যা প্রায় ১৫৪টি। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য জলজ উদ্ভিদ হলো-পানিফল, মাখনা, পদ্ম, শাপলা, হোগলা, অ্যাজুলা, স্যালভিয়া, কচুরীপানা ইত্যাদি। প্রাণীর মধ্যে ৭৫০ প্রজাতির পাখি, ৭৬০ প্রজাতির মিঠা ও লোনাপানির মাছ, ঝিনুক, শামুক, সাপ ও বহু অমেরুদণ্ডী প্রাণী বসবাস করে।

(iii) হ্রদ ও পুকুর (Lakes & Ponds) : এমন জলাশয়ের আয়তন কয়েক মিটার থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের গভীরতাও বেশ তারতম্য হয়ে থাকে। অনেক পুকুর শীতকালে শুকিয়ে যায়। হ্রদের গভীরতা অনেক (বৈকাল হ্রদ ৪৭৪২ ফুট) এবং স্থায়ী জলাধার। গভীর হ্রদগুলো আনুভূমিক তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত।

(a) **বেলা অঞ্চল (Litoral zone) :** এটি হ্রদের কিনারার উষ্ণ অঞ্চল। এখানে বিভিন্ন ধরনের শৈবাল, মূলবদ্ধ ও ভাসমান উদ্ভিদ জন্মে থাকে। প্রাণীদের মধ্যে স্নেইল, পতঙ্গ, ক্রাস্টাশিয়ান, মাছ ও উভচর প্রাণী বাস করে। পতঙ্গের মধ্যে ড্রাগন ফ্লাই এবং মিজেস প্রধান। এ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো ডাহুক, সাপ ও কচ্ছপের খাদ্য।

(b) **অগভীর অঞ্চল (Limnetic zone) :** এটি হ্রদের ওপরের মুক্ত অঞ্চল। এ অঞ্চল আলোকিত এবং প্রধানত ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্লাংকটন থাকে। এছাড়া কিছু ক্ষুদ্রাকার মাছও এখানে দেখা যায়।

(c) **গভীর অঞ্চল (Profundal zone) :** হ্রদের গভীরে ক্ষীণ আলোকিত অঞ্চলকে বোঝায়। এখানকার পানি ঠাণ্ডা। প্রাণীগুলো পরভোজী প্রকৃতির কারণ এরা মৃতদেহ ভক্ষণ করে থাকে।

(খ) সামুদ্রিক বা লোনাপানির বায়োম (Oceans & Seas) : মহাসাগর, সাগর ও মোহনা মিলে পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় ৩/৪ ভাগ দখল করে আছে লোনাপানির বায়োম। **এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো এবং প্রথম বায়োম।** সাগরের লবণাক্ততা প্রায় ৩৫ ppm এবং pH_8। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে পৃষ্ঠতলে পানির তাপমাত্রা 27°C আর মেরু অঞ্চলে 3°C। সাগরের ৪টি অঞ্চলেই প্রচুর জীববৈচিত্র্য বিদ্যমান।

(i) **গড়ান অঞ্চল (Intertidal zone) :** যেহেতু এ অঞ্চলটি প্রতিদিন দু'বার জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয় তাই এখানে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। ওপরের অংশে কয়েকটি প্রজাতির ডায়াটম, বাদামি শৈবাল, লোহিত শৈবাল ও কিছু সবুজ শৈবালও জন্মে থাকে। প্রাণীদের মধ্যে স্নেইল, ক্রাবস, ছোটো ছোটো মাছ থাকে। এছাড়া ক্রাস্টাশিয়ান ও মোলাস্কা প্রাণী থাকে।

(ii) **পেলাজিক অঞ্চল (Pelagic zone) :** সাগরের পৃষ্ঠীয় যুক্ত অঞ্চলকে বোঝায়। এ অঞ্চলে আগাছা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে থাকে। এর পাশাপাশি প্লাংকটনও থাকে। প্রাণীদের মধ্যে নানা ধরনের মাছ, ডলফিন, হাঙ্গর ও তিমি থাকে।

(iii) বেনথিক অঞ্চল (Benthic zone) : পেলাজিকের নিচে অল্প আলো বা আলোহীন অঞ্চলকে বোঝায়। এখানে বালু, নুড়ি এবং মৃতদেহ থাকে। মূলত সামুদ্রিক আগাছা, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া, স্পঞ্জ, সি-স্টার মাছ থাকে।

(iv) এবিসাল অঞ্চল (Abyssal zone) : এটি সমুদ্রের গভীরতম স্থানকে বোঝায়। তাপমাত্রা প্রায় 3°C। পানির চাপ অনেক। পুষ্টি খুব কম থাকে। অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী, মাছ এবং কেমোসিনথেটিক ব্যাক্টেরিয়া থাকে।

প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল (Zoogeographical regions)

পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক পরিবেশ সর্বত্র একই রকম নয়। এর কোথাও বরফ শীতল, কোথাও নাতিশীতোষ্ণ, আবার কোথাও উষ্ণ; এর কোথাও তৃণভূমি, কোথাও জলাভূমি, কোথাও মরুভূমি বা গভীর অরণ্যভূমি। এসব পরিবেশের কোনোটাই জীবপ্রজাতিবিহীন নয়। প্রতিটি প্রাকৃতিক পরিবেশেই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিছু জীবপ্রজাতি রয়েছে। তুন্দ্রা অঞ্চলের অধিকাংশ জীবপ্রজাতিই মরু অঞ্চলে পাওয়া যায় না। উদ্ভিদ তার স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে পারে না, কাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ প্রজাতি জন্মাতে দেখা যায়। প্রাণীরা প্রয়োজনে তাদের বাসস্থান ত্যাগ করে এদিক ওদিক যেতে পারে, তারপরও ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী লক্ষ্য করা

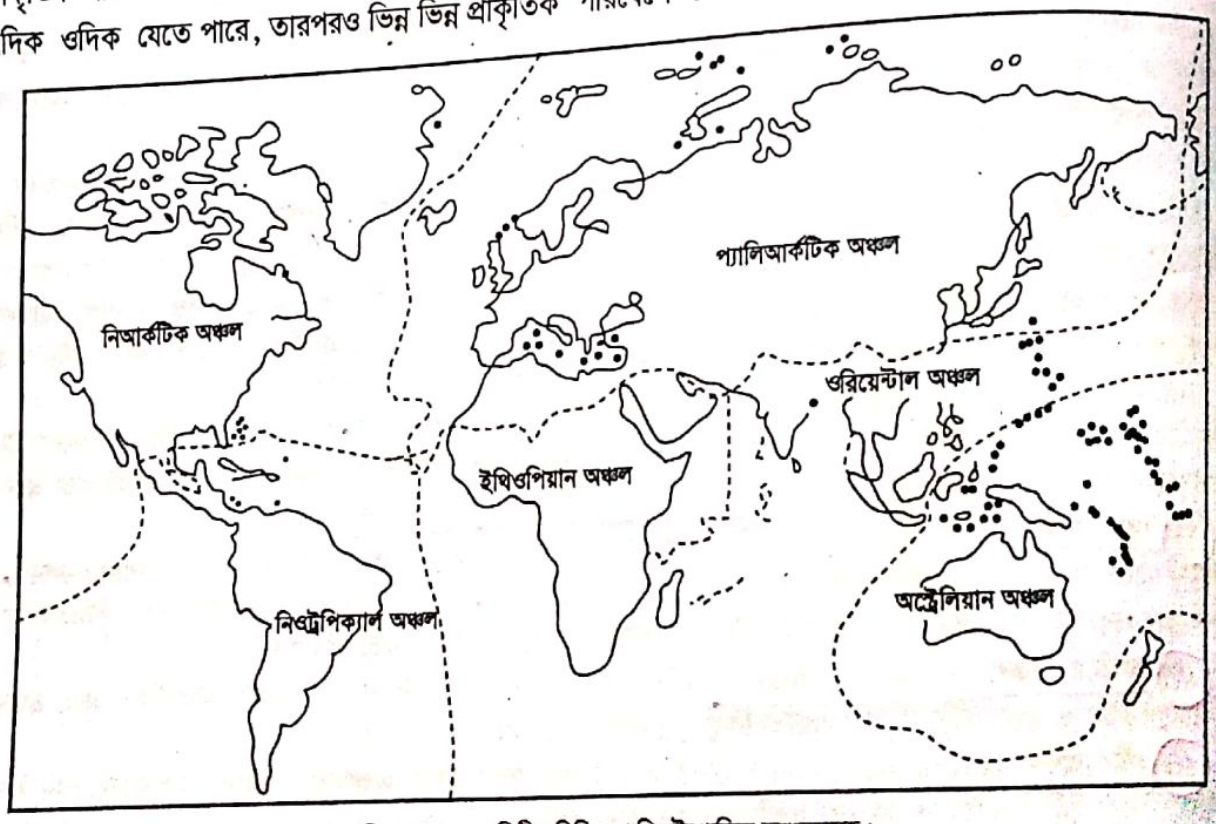

চিত্র ১২.১৪ : পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ।

যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থান ও বিস্তৃতির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর বুকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অবস্থান ও বিস্তৃতির ওপর ভিত্তি করে P. L. Sciater ১৮৫৭ সালে পৃথিবীকে মোট ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে A. R. Wallace সামান্য পরিবর্তন সাপেক্ষে ঐ ৬টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলকে সমর্থন করেন। ছয়টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চল নিম্নরূপ :

১। প্যালিআর্কটিক অঞ্চল, ২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল, ৩। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল, ৪। নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল, ৫। ইথিওপিয়ান অঞ্চল, ৬। নিআর্কটিক অঞ্চল।

একনজরে A. R. Wallace কর্তৃক প্রদত্ত ছক অনুসারে পৃথিবীর প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর নাম, সেই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের নাম এবং সেসব অঞ্চলের প্রধান কয়েকটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম দেওয়া হলো :

অঞ্চলের নাম	অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহের নাম	প্রধান মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাম
১। প্যালিআর্কটিক অঞ্চল (Palaearctic region)	ইউরোপের সমগ্র অংশ, আফ্রিকার উত্তরাংশ, এশিয়ার উত্তরাঞ্চল, হিমালয়ের উত্তর অংশ, চীন, জাপান ও কোরিয়ার উত্তর অংশ, ইরান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশসমূহ।	হরিণ, ভালুক, ভোঁদর, বলগা হরিণ, উট, গরু, কবুতর, ফ্লেমিংগো, উটপাখি, পেলিকন, চায়নিজ এলিগেটর, প্যাডেল ফিস, সাকারফিস, ক্যাটফিস।
২। ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental region)	বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, ভূটান, ফিলিপাইন, তাইওয়ান ইত্যাদি।	হাতি, বাঘ, গীবন, ভালুক, ওরাংওটাং, টাপীর, বাদুর, কবুতর, ফিঙে, কোকিল, ব্লু বার্ড, ময়ূর, কুমির, গুইসাপ, রুই, কাতলা, মৃগেল, ক্যাটফিস।
৩। অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল (Australian region)	অস্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া, নিউজিল্যান্ড, নিউগিনি, ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চল ও প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপ।	ক্যাঙ্গারু, ওয়াল্লাবি, কোয়েলা, ওমব্যাট, প্লাটিপাস, অপোসাস, লায়ার বার্ড, ক্যাসোয়ারি কাকাতুয়া, টিয়া, এমু, বার্ডস অব প্যারাডাইস, কাঠঠোকরা, কিউই, স্ফেনোডন, টিফলপস।
৪। নিওট্রপিক্যাল অঞ্চল (Neotropical region)	মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইত্যাদি।	ভালুক, হরিণ, কুকুর, লামা, অপোসাম, উটপাখি, রিয়া, অস্ট্রিচ, সারস, বাজ, প্যাঁচা, হামিংবার্ড, কুমির, কচ্ছপ, কোরাল, সাপ, বোয়া, ভাইপার, বাইন মাছ, ক্যাটফিস, লাংফিস।
৫। ইথিওপিয়ান অঞ্চল (Ethiopian region)	আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ অঞ্চল, আরবের দক্ষিণ অঞ্চল, মাদাগাস্কার (বা মালাগাছি) ও মাদাগাস্কারের নিকটবর্তী কিছু মহাসাগরীয় দ্বীপ।	গরিলা, শিম্পাঞ্জী, লেমুর, হাতি, ভোঁদর, হায়না, গণ্ডার, আর্মাডিলো, জিরাফ, জেব্রা, জলহস্তী, উটপাখি, বাজ, শকুন, সারস, ফিঙে, কুমির, গুইসাপ, বোয়াপাইথন, ক্যাটফিস, লাংফিস।
৬। নিআর্কটিক অঞ্চল (Nearctic region)	গ্রিনল্যান্ড, মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চল, কানাডা, উত্তর আমেরিকার অধিকাংশ, আইসল্যান্ড ইত্যাদি এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।	ঘোড়া, উট, লামা, আলপাকা, গোয়াঙ্কা, নেকড়ে, মেরুশিয়াল, ভালুক, ক্যাঙারু, বাইসন, লালহরিণ, পেলিকান, শকুন, টার্কিস, হামিংবার্ড, ফিঙে, কচ্ছপ, এলিগেটর, কুমির, প্রবাল, সাপ, স্যালামান্ডার, প্যাডেল ফিস, বো ফিন, সাকার ফিস, ক্যাটফিস ইত্যাদি।

পৃথিবীর ছয়টি প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্য থেকে এখানে কেবল ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ওরিয়েন্টাল অঞ্চল (Oriental Region)

ভৌগোলিক সীমানা : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উত্তরে আফগানিস্তান ও চীন, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে ইরান ও আরব এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর অবস্থিত।

অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ : ক্রান্তীয় এশিয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন, শ্রীলংকা, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, নেপাল, ভূটান ইত্যাদি ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের অন্তর্গত।

এ অঞ্চলটি প্রধান চারটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত; যথা—

১। ভারতীয় উপ-অঞ্চল (Indian subregion) : এ উপ-অঞ্চলটি সিন্ধুনদ ও হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে গোয়া হয়ে মহীশুর, সমগ্র মধ্য ও উত্তর ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশ ভারতীয় উপ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

২। সিংহলীয় উপ-অঞ্চল (Ceylonése subregion) : ভারতীয় উপদ্বীপের অংশবিশেষ এবং সমগ্র শ্রীলংকা এ উপ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

৩। **ইন্দোচীন উপ-অঞ্চল (Indo-China subregion)** : চীনের প্যালিআর্কটিক সীমানার দক্ষিণাংশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, আন্দামান ও হাইনান দ্বীপপুঞ্জ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

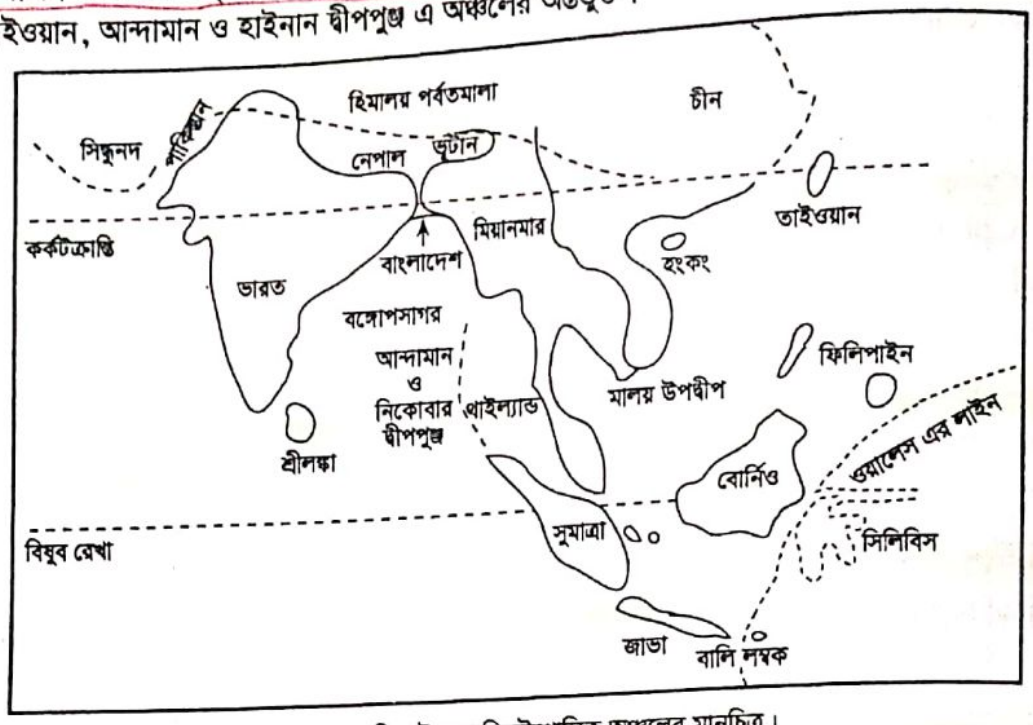

চিত্র ১২.১৫ : ওরিয়েন্টাল প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের মানচিত্র।

৪। **ইন্দোমালয় উপ-অঞ্চল (Indo-Malayan subregion)** : মালয় উপদ্বীপ ও ইস্ট ইন্ডিজের কতগুলো দ্বীপ যেমন বোর্নিও, জাভা, সুমাত্রা এবং নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

জলবায়ু : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের প্রায় সমগ্র অংশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। এ অঞ্চলের পূর্বাংশে স্টেপ ও প্রেইরি তৃণভূমি, মধ্যভাগে মৌসুমি উদ্ভিদবিশিষ্ট সাভানা তৃণভূমি এবং সীমিত অঞ্চলে ক্রান্তীয় জলবায়ু দেখা যায়। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের দিনরাত্রি প্রায় সমান।

উদ্ভিদকুল (Flora) : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলে সারা বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এখানকার জলবায়ু আর্দ্র ও গরম বিধায় এখানে চিরসবুজ বৃক্ষের গভীর বনাঞ্চল এবং সিক্ত পত্রঝরা বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০ সে.মি.। এ অঞ্চলে ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট, ডেসিডুয়াস ফরেস্ট, ট্রপিক্যাল গ্রাসল্যান্ড এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেখা যায়। এখানে প্রচুর শাল (*Shorea robusta*), গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), পশুর (*Zylocarpus granatum*), গোলপাতা (*Nipa fruticans*), বেত (*Calamus rotung*), নারিকেল (*Cocos nucifera*), সুপারি (*Areca catechu*), রাবার (*Hevea brasiliensis*), হেতাল (*Phoenix paludosa*), আম (*Mangifera indica*), জাম (*Syzygium cumini*), কাঁঠাল (*Artocarpus heterophyllus*), সিঙ্কোনা (*Cinchona officinalis*), কফি (*Coffea arabica*), চা (*Camellia sinensis*), পাট (*Corchorus capsularis*), কার্পাস তুলা (*Gossypium herbaceum*) ইত্যাদি গাছ জন্মে। ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উপকূলে গরান (*Ceriops decandra*) বা ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল দেখা যায়।

প্রাণিকুল (Fauna) : এ অঞ্চলে বহু ধরনের প্রাণী রয়েছে। এদেরকে নিম্নলিখিত উপায়ে সাজানো যায় :

মিঠা বা স্বাদুপানির মাছ : ইলিশ (*Tenualosa ilisha*), রুই মাছ (*Labeo rohita*), মাগুর মাছ (*Clarius batrachus*), লইট্যা মাছ (*Harpodon nehereus*), হাঙ্গর মাছ (*Scoliodon sorrakowah*), কই মাছ (*Anabus testudineus*), কালি মাছ (*Notopterus notopterus*), পাবদা মাছ (*Ompok pabda*), তারাবাইন (*Macrognathus oral*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

উভচর : কুনোব্যাঙ (*Duttaphrynus melanostictus*), সোনাব্যাঙ (*Haplobatrachus tigerinus*), গেছোব্যাঙ (*Rhacophorus fergusonil*), স্যালামান্ডার (*Tylotoriton vercossa*), ইকথিওফিস্ (*Ichthyophis*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

সরীসৃপ : গোখরা (*Naja naja*), হলুদ কচ্ছপ (*Indotestudo elongata*), গুইসাপ (*Varanus bengalensis*), কমোডোড্রাগন, গিরগিটি, তক্ষক, রক্তচোষা (*Calotes versicolor*), কেউটে, উড়ুক্কু টিকটিকি (*Draco maculatus*), চন্দ্রবোড়া, অজগর (*Python morulus*) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী।

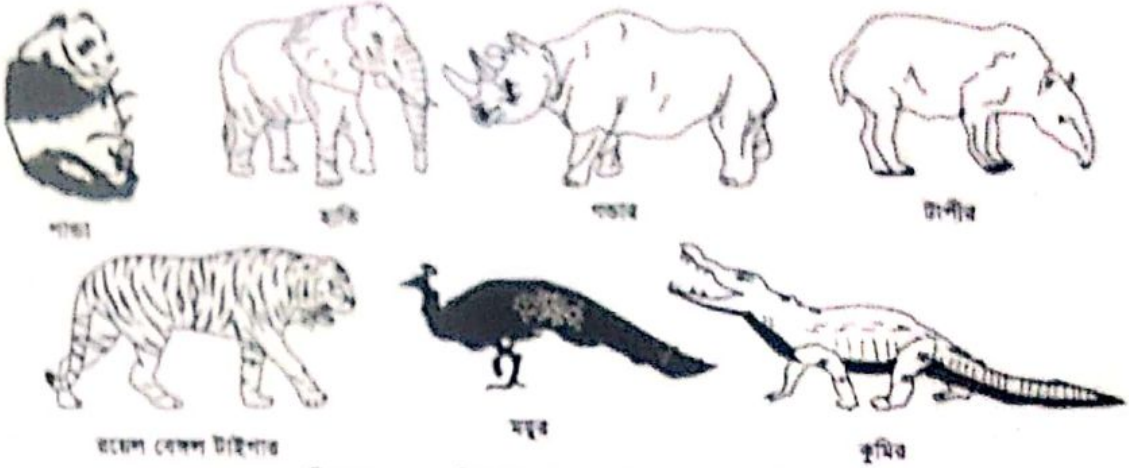

চিত্র ১২.১৬ : ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য প্রাণিকুল।

পক্ষীকুল : টিয়া (*Psittacula eupatria*), কবুতর (*Columba livia*), শ্বেত কাকাতুয়া (*Cacatua alba*), ফিঙ্গে, কোকিল (*Phaenicopheus* sp), ময়ূর (*Pavo cristatus*), ব্লু বার্ড, বনমোরগ (*Gallus gallus*), বাবুই, শালিক, মাছরাঙ্গা, দোয়েল (*Copsychus saularis*), পাহাড়ি ঘুঘু (*Columba puncicea*), হলদে পাখি, রাজশকুন (*Sarcogyps calvus*), বুলবুলি, হাঁস, প্যাঁচা (*Bubo bubo*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

স্তন্যপায়ী : এ অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার (*Panthera tigris*), চিতাবাঘ (*Banis javanica*), হাতি (*Elephas maximus*), উল্লুক (*Hylobates hoolock*), ভালুক (*Melarsus ursinus*), ওরাংওটাং (*Pongo pygmaeus*), বানর (*Macaca mulatta*), বুনো মহিষ (*Bubalus bubalis*), দ্বিশৃঙ্গী গণ্ডার (*Dicerorhinus sumatrensis*), চিত্রা হরিণ (*Axis axis*), খরগোশ, শুশুক (*Platanista gangetica*), সজারু, টাপীর, বাদুর (*Pteropus* sp), বন্যশূকর, সিংহ (*Panthera leo*), চশমাপড়া হনুমান (*Trachypithcus phayrei*), হায়েনা (*Hyaena* sp), বড়ো বেজী (*Herpestes edwardsi*), বনরুই (*Manis crassicaudata*), পান্ডা (*Ailuropoda melanoleuca*) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

Endemic (আঞ্চলিক) : কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ উদ্ভিদ বা প্রাণীকে উক্ত অঞ্চলের এন্ডেমিক উদ্ভিদ/প্রাণী বলে।

Exotic (বিদেশি) : এক ভৌগোলিক অঞ্চল (দেশ) থেকে অন্য ভৌগোলিক অঞ্চল (দেশ)-এ প্রবর্তনকারী উদ্ভিদ বা প্রাণীকে আগত অঞ্চলের **Exotic** উদ্ভিদ/প্রাণী বলে; যেমন—পেঁপে, আনারস, তেলাপিয়া ও সিলভার কার্প মাছ বাংলাদেশের Exotic (পরদেশি)।

ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের কয়েকটি এন্ডেমিক ফনা (প্রাণী)

শ্রেণি	সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
Osteichthyes (মাছ)	নাপতি কই সবুজ রুই	*Badis badis* *Lubeo fisheri*
Amphibia (উভচর)	গারো পাহাড়ি ব্যাঙ ড্যানিয়েল ব্যাঙ	*Rana garoensis* *Rana daniel*
Reptilia (সরীসৃপ)	ঘড়িয়াল সিলেটি কাছিম	*Gavialis gangeticus* *Kachuga sylhetensis*
Aves (পাখি)	বর্মী ময়ূর শ্বেত কাকাতুয়া	*Pavo muticus* *Cacatua alba*
Mammalia (স্তন্যপায়ী)	সিংহলেজী বানর শুশুক	*Macaca silenus* *Orcaella brevirostris*

CamScanner

বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forest of Bangladesh)

বাংলাদেশ ২০°৩৩´ থেকে ২৬°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮° থেকে ৯২°৫৬´ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত একটি জনবহুল ছোট্ট দেশ। বর্তমানে বাংলাদেশের আয়তন মোটামুটি ১,৪৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার। এর পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব– তিন দিকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার দক্ষিণাংশ নাফ নদী দ্বারা মিয়ানমার (বার্মা) থেকে পৃথক। দেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ছয় ঋতুর দেশ হলেও বাংলাদেশে তিনটি ঋতু উল্লেখযোগ্য। ঋতু তিনটি হলো গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। সবচেয়ে গরম (অধিক তাপমাত্রা) এপ্রিল-মে এবং সবচেয়ে বেশি শীত জানুয়ারি মাসে। জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে অধিক বৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের বড়ো অংশ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। বাকি অংশে ছোটো বড়ো অনেক বন দেখা যায়। একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা উচিত। বাংলাদেশে বর্তমানে বনাঞ্চল কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১০ ভাগের মতো। প্রয়োজনের তুলনায় এ পরিমাণ অনেক কম।

বনের ধরন অনুযায়ী বাংলাদেশের বনকে নিম্নলিখিত উপায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

১। চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল, ২। পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল এবং ৩। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল।

চিত্র ১২.১৭ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল।

১। চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বনাঞ্চল (Evergreen and semi-evergreen forest) : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চিরসবুজ ও অর্ধ-চিরসবুজ বন অবস্থিত।

এ বনের বৈশিষ্ট্য

(i) বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২২৫ সে.মি (চট্টগ্রামে) থেকে ৫০০ সে.মি. (সিলেট), তাই বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে।

(ii) মাটিতে হিউমাস অধিক, মাটি অ্যাসিডিক (অম্লীয়)।

(iii) বন অপেক্ষাকৃত ঘন।

(iv) ভূমিরূপ : ছোটো ছোটো পাহাড় ও মাঝে মাঝে খাদ।

(v) অধিকাংশ উদ্ভিদ চিরসবুজ প্রকৃতির।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ

সবচেয়ে উঁচু বৃক্ষের মধ্যে সিভিট (*Swintonia floribunda*), গর্জন (*Dipterocarpus turbinatus*), চন্দুল (*Tetrameles nudiflora*); দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃক্ষের মধ্যে নাগেশ্বর (*Mesua ferrea*), বাটনা (*Quercus* spp.), পিতরাজ (*Amoora wallichii*) প্রধান। পত্রঝরা বৃক্ষের মধ্যে কড়ই (*Albizia procera*), গামার (*Gmelina arborea*), ভাদি (*Lannea coromandelica*), চাপালিশ (*Artocarpus chaplasha*), উদাল (*Sterculia vilosa*) ইত্যাদি প্রধান। এ বনে প্রচুর পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ, কচু জাতীয় উদ্ভিদ ও বিভিন্ন প্রজাতির ফার্ন জন্মে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক দুর্গম ও বিস্তর এলাকা নিয়ে বাঁশবন অবস্থিত। অধিকাংশ বাঁশই মূলী বাঁশ (*Melocanna baccifera*)। খাড়া ঢাল ও অগভীর খাতের কারণে কৃষি কাজের অনুপযোগী। তবে কোনো কোনো এলাকায় জুম চাষ (Jhum cultivation) হয়ে থাকে। জুম চাষের পর দীর্ঘদিন পড়ে থাকা এলাকায় ছনবন সৃষ্টি হয়। ছন বনের প্রধান উদ্ভিদ ছন (*Imperata cylindrica*) এবং খাগড় বা কাশ (*Saccharum spontaneum*)।

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সেগুন বন লাগানো। ১৮৬১ সালে বার্মা থেকে বীজ এনে প্রথম সেগুন বাগান করা হয় কাপ্তাই এলাকায়। সেগুন *(Tectona grandis)* কাঠ বাংলাদেশের প্রথম সারির কাঠ।

সোয়াম্প ফরেস্ট হলো মিঠাপানি বা স্বাদুপানির জলাশয় দ্বারা জলাবদ্ধ বন। সিলেটের উত্তরাংশে **জলাবদ্ধ বন** (Swamp forest) আছে। এটি **রাতারগুল জলাবন হিসেবে পরিচিত**। এ বনের প্রধান উদ্ভিদ নল খাগড়া (*Phragmitis karka*), কাশ (*Saccharum spontaneum*) এবং ইকড়া ঘাস (*Erianthus ravennae*)। বৃক্ষের মধ্যে হিজল (*Barringtonia acutangula*) এবং করচ গাছ (*Pongamia pinnata*) প্রধান। **বাংলাদেশের একমাত্র বন্য গোলাপ** (*Rosa involucrata*) এখানে পাওয়া যায়। রাতারগুল বন দেখার জন্য প্রচুর পর্যটক এসে থাকে। এখানে একটি **পর্যবেক্ষণ টাওয়ার** আছে।

চিত্র ১২.১৮ : সিলেটের রেমা-কেলেঙ্গা বনের অংশবিশেষ।

বৃহত্তর সিলেটের বনাঞ্চলের মধ্যে রেমা-কেলেঙ্গা, লাওয়াছড়া, সাতছড়ি উল্লেখযোগ্য নাম। সিভিট ও গর্জন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে যথেষ্ট পাওয়া গেলেও সিলেটের বনে এগুলো কম। সিলেটে প্রচুর বেত জন্মে।

প্রাণিকুলের মধ্যে আসামী বানর, চশমা হনুমান, মুখপোড়া হনুমান, উলুক, গেছোভালুক, বুনো শূকর, উড়ন্ত কাঠবিড়ালী, শেয়াল ইত্যাদি প্রধান।

২। পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বনাঞ্চল (Deciduous forest) : যে বনের সকল বৃক্ষের পাতা একসাথে ঝরে যায় তাদের দিয়ে গঠিত বনকে পত্রঝরা বা পর্ণমোচী বন বলে। এ বন ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, শেরপুর, কুমিল্লার ময়নামতি এবং বরেন্দ্র অঞ্চলে অবস্থিত। **ময়নামতির বন শালবন বিহার নামে, শেরপুর জেলার উত্তরে পাহাড়ি এলাকায় রাংটিয়া বন ও গজনী বন নামে পরিচিত।**

বরেন্দ্র বনাঞ্চল : রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলায় অবস্থিত।

মধুপুর বনাঞ্চল : টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বেশ কিছু অংশ নিয়ে গঠিত।

রাজেন্দ্রপুর বনাঞ্চল : গাজীপুর জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত।

চন্দ্রা বনাঞ্চল : গাজীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে এটি অবস্থিত।

লালমাই শালবন অঞ্চল : এটি কুমিল্লা জেলায় লালমাই পাহাড়ে অবস্থিত।

চিত্র ১২.১৯ : শালবন।

পত্রঝরা বনের বৈশিষ্ট্য

(i) বসন্তকালে গাছে নতুন পাতা গজায় আর শীতকালে এ বনের বৃক্ষরাজির পাতা ঝরে যায়।

(ii) বার্ষিক বৃষ্টিপাত কম, ১২৫ সেমি (বরেন্দ্র অঞ্চলে) থেকে ১৭৫ সেমি (ঢাকায়), তাই বাতাসের আর্দ্রতা অপেক্ষাকৃত কম।

(iii) লৌহের (আয়রন-অক্সাইড হিসেবে) পরিমাণ অধিক থাকায় মাটির বর্ণ লাল বা হলুদাভ, মাটি বেশ অ্যাসিডিক, বর্ষায় কর্দমাক্ত ও শীতে শুকনো।

(iv) বন তুলনামূলকভাবে কম ঘন, তবে মধুপুর অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ঘন।

CamScanner

(v) উঁচু 'চালা' এবং ফাঁকে ফাঁকে সমতলভূমি 'বাইদ' অবস্থিত। চালায় বন এবং বাইদে ধান চাষ হয়।
(vi) গড় তাপমাত্রা শীতকালে 17.8°C এবং গ্রীষ্মকালে 26.70°C।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ

এ বনের প্রধান বৃক্ষ শাল। শাল বৃক্ষের পরিমাণ কোনো কোনো স্থানে শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ পর্যন্ত। তাই এ বনের অপর নাম **শালবন**। বর্তমানে অধিকাংশ মূল শালবৃক্ষই কর্তিত। মূল বৃক্ষের গোড়া থেকে গজানো চারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান বন, তাই এ বনের আরেক নাম **গজারী বন**।

প্রধান বৃক্ষ শাল (*Shorea robusta*)। এ ছাড়াও চালতা (*Dillenia pentagyna*), কড়ই (*Albizia procera*), গাছিগজারী (*Miliusa velutina*), কুম্ভী (*Careya arborea*), বহেড়া (*Terminalia bellirica*), কুরচি (*Holarrhena antidysenterica*) ইত্যাদি বৃক্ষ জন্মে থাকে। শতমূলী (*Asparagus racemosus*), উলট চণ্ডাল (*Gloriosa superba*) এবং সর্পগন্ধা (*Rouvolfia serpentina*) তিনটি বিপদাপন্ন ভেষজ উদ্ভিদ এ বনে দেখা যায়।

এ বনে প্রাণীদের মধ্যে মায়া হরিণ (*Muntiacus muntjak*), বানর (*Macaca mulatta*), মুখপোড়া হনুমান, শেয়াল (*Canis aureus*), বুনো শূকর, সজারু, বাদুর, বেজি, খাটাস (*Viverricula indica*) ভুতুম পেঁচা (*Bube zeylonensis*) মেছো বিড়াল (*Felis viverrinus*) প্রধান।

৩। ম্যানগ্রোভ বা উপকূলীয় বনাঞ্চল (Mangrove or Tidal forest) : লবণাক্ত ও কর্দমাক্ত ভেজা মাটির বনকে **ম্যানগ্রোভ বন** বলে। বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড়ো ম্যানগ্রোভ বনভূমি। ম্যানগ্রোভ বনের বড়ো অংশ পটুয়াখালী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে বৃহত্তর খুলনা পাড় হয়ে পশ্চিমবঙ্গের কাছে রায়মঙ্গল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অংশ **সুন্দরবন** নামে পরিচিত। এছাড়া মাতামুহুরী নদীর মোহনায় **চকোরিয়া সুন্দরবনও** ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত এবং নাফ নদীর তীরে কিছু **ম্যানগ্রোভ** বন দেখা যায়। সুন্দরবনের অর্থাৎ ম্যানগ্রোভের ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রায় ৬২% বাংলাদেশে অবস্থিত। সুন্দরবনের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২০০ সেমি এবং প্রাণিকুলে প্রজাতির সংখ্যা স্থলভাগে ২৮৯টি এবং জলভাগে ২১৯টি প্রজাতি রয়েছে।

ম্যানগ্রোভ বনের বৈশিষ্ট্য

(i) এ বন চিরসবুজ বন।
(ii) বনের নিম্নাঞ্চল দৈনিক দু'বার জোয়ারের পানিতে সিক্ত হয়।
(iii) মাটি এবং পানি লবণাক্ত। মাটির pH ৭ এর কাছাকাছি।
(iv) মাটিতে অক্সিজেনের অভাব থাকায় অধিকাংশ বৃক্ষের শ্বাসমূল বা নিউমেটোফোর হয়।
(v) লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক ওজনের ১০–৫০ ভাগ।
(vi) জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হতে অনেক উদ্ভিদে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়।
(vii) অসংখ্য নদী-উপনদী ও চ্যানেল দ্বারা সুন্দরবন ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত।

প্রধান প্রধান উদ্ভিদ

নদীপাড়ের কম লবণাক্ত (হালকা) পানিতে গোলপাতা (*Nipa fruticans*), হিতাল (*Phoenix paludosa*), সুন্দরী (*Heritiera fomes*), গেওয়া (*Excoecaria agallocha*), কেওড়া (*Sonneratia apetala*), আমুর (*Amoora cucullata*), গরান (*Ceriops decandra*) জন্মে থাকে। অধিক লবণাক্ত (চরম) অঞ্চলে কাঁকড়া (*Bruguiera gymnorrhiza*), বাইন (*Avicennia officinalis*), পশুর (*Xylocarpus moluccensis*), ধুন্দুল (*Xylocarpus granatum*) জন্মে থাকে। প্রধান লতা সুন্দরীলতা (*Brownlowia lanceolata*) এবং গুল্মজাতীয় বোহাল (*Hibiscus tiliaceous*) ও হাড়গোজা (*Acanthus ilicifolius*) প্রধান। সুন্দরবনে টাইগার ফার্নের (*Acrostichum aureum*) ঝোপ আছে। সুন্দরবনে কোনো বাঁশ জন্মে না। হরেক রকমের অর্কিড জন্মে।

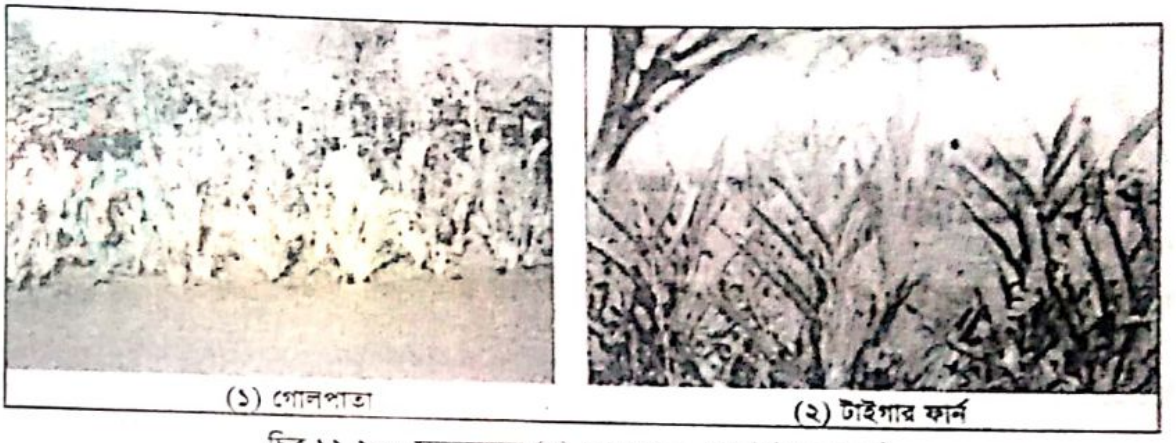

(১) গোলপাতা (২) টাইগার ফার্ন

চিত্র ১২.২০ : সুন্দরবনের (১) গোলপাতা, (২) টাইগার ফার্ন।

প্রাণিকুল : উদ্ভিদের মতো সুন্দরবন প্রাণিকুলেও সমৃদ্ধ। এখানকার স্থলভাগে ২৮৯টি প্রাণী এবং জলভাগে ২১৯টি প্রাণী প্রজাতি রয়েছে। এছাড়া এখানে ৩১৫টি প্রজাতির পাখিও রয়েছে।

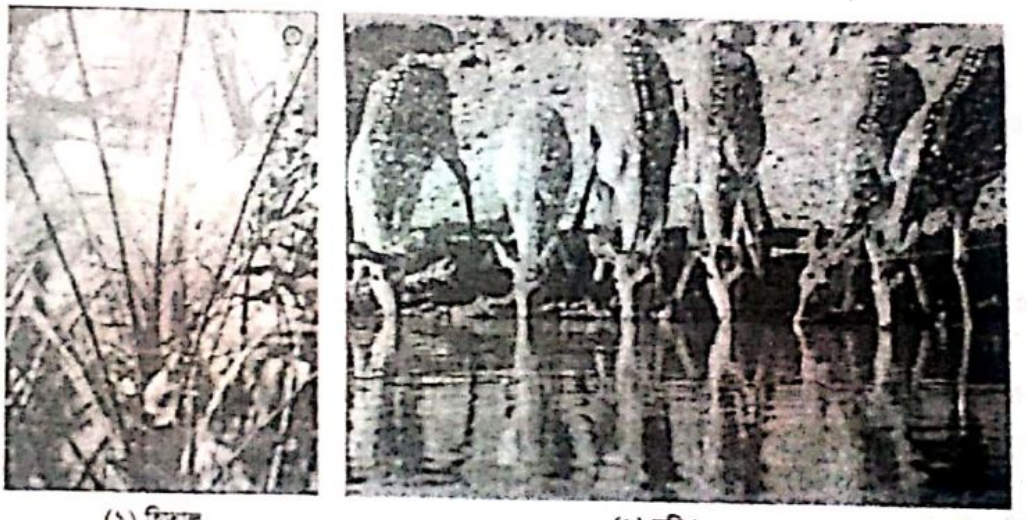

(১) হিতাল (২) হরিণ

চিত্র ১২.২১ : সুন্দরবনের (১) হিতাল, (২) হরিণ।

সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ২০১৩ সালের হিসাব মতে যার সংখ্যা ৪৪০টি। এখানে বর্তমানে হরিণ আছে ৮০-৮৫ হাজার, বানর ৪০-৫০ হাজার, লোনাপানির কুমির ২০০-২৫০টি। এখানে ১২০ প্রজাতির মাছ এবং ২৭০ প্রজাতির পাখি আছে। এছাড়াও আছে বনমোরগ, অজগর, বাদামি কাঠবিড়ালী, বুনোশূকর, পেরাবন সাপ ইত্যাদি।

সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট (বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা) : সুন্দরবনের তিনটি বন্যজীব অভয়ারণ্য নিয়ে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট গঠিত। এর আয়তন ১৪০০ বর্গকিলোমিটার, যার মধ্যে ৯১০ বর্গকিলোমিটার বনভূমি আর ৪৯০ বর্গকিলোমিটার জলাভূমি। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে UNESCO-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি ১৯৯৭ সালে তাদের ২১তম সেশনে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ-এর অংশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এবং বাংলাদেশ সরকার একে ১৯৯৯ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে।

উপকূলীয় বনাঞ্চল ও সবুজ বেষ্টনী (Costal-tidal forest & Green belt)

উপকূলীয় বনাঞ্চল উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য

১। উপকূলীয় বনাঞ্চলের বেশির ভাগ উদ্ভিদ বহুবর্ষজীবী ও দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হয়।

২। লবণাক্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌন জননের ঘটনা কমে যায়।

৩। বিভিন্ন ধরনের ক্লোনাল বংশবৃদ্ধি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

৪। বৃদ্ধির হার শস্য উদ্ভিদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম।

৫। দ্রবীভূত নাইট্রোজেনের ঘনত্ব বেশি থাকে।

৬। পাতার অভ্যন্তরীণ লবণাক্ততার পরিমাণ শুষ্ক ওজনের শতকরা ১০-৫০ ভাগ।

৭। জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম দেখা যায়।

৮। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসমূল থাকে। জোয়ারে প্লাবিত বা সিক্ত মাটি থেকে পর্যাপ্ত O_2 না পেলে শ্বাসমূল বাতাস থেকে O_2 গ্রহণ করে।

বাংলাদেশে উপকূলীয় বনাঞ্চল

বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিক স্থলবেষ্টিত কিন্তু দক্ষিণ দিকে রয়েছে উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলো, বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা সরাসরি সাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়াও সাগরবক্ষে সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মহেশখালী, উড়িরচর, চর কুকড়ি-মুকড়িসহ অসংখ্য ছোটো-বড়ো দ্বীপ ও চর এলাকা রয়েছে। সম্পূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় ৭১০ কিমি. লম্বা।

ভূমি ও উদ্ভিজ্জের ভিত্তিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১। পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল : বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে বদর মোকাম থেকে ফেনী নদীর মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে পাহাড় আছে। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ১৪৫ কিমি. দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত আছে। বাংলাদেশের একমাত্র **প্রবাল দ্বীপ** সেন্টমার্টিন এ অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বাইন, গরান, গেওয়া প্রধান উদ্ভিদ। এছাড়া গোলপাতা, টাইগার ফার্ন, হাড়গোজা ইত্যাদি দেখা যায়।

২। মধ্য উপকূলীয় অঞ্চল : ফেনী নদীর মোহনা থেকে সুন্দরবনের পূর্ব পর্যন্ত সমতল বিস্তৃত অংশ। এখানে ৬০টির মতো দ্বীপ আছে এবং প্রধান উদ্ভিদ কেওড়া। এছাড়া এখানে বাইন, গেওয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ দেখা যায়।

৩। পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল : সম্পূর্ণ সুন্দরবন এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ অঞ্চলে বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি গড়ে ওঠেছে। সুন্দরী, গেওয়া, গরান, বাইন, গোলপাতা, হাড়গোজা, টাইগার ফার্ন প্রভৃতি এ অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ।

প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ একটি ঝড়প্রবণ এলাকা। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সিডর, টর্নেডো, ফনি, বুলবুল আম্পান, মোখা ইত্যাদি নামের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই উপকূলীয় জেলাসমূহে আঘাত হানে। এর ফলে ব্যাপক প্রাণ ও সম্পদহানি ঘটে। সমুদ্রের দ্বীপ ও চর এলাকা বলতে গেলে সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আমাদের এ বিস্তীর্ণ এলাকাকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, সিডর, ঘূর্ণিঝড় এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করার একটি চমৎকার উপায় হলো উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃষ্টিকরণ। সবুজ বেষ্টনী হলো উপকূলীয় বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে একটি শক্ত ও মজবুত সবুজ বেষ্টনী তৈরি করা।

১৯৯১ সনে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এর প্রেক্ষিতেই উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত মানুষ ও তাদের সম্পদ রক্ষার ব্রত নিয়ে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং উপকূলীয় বনবিভাগ নামে একটি বনবিভাগ সৃষ্টি করা হয়। প্রাথমিকভাবে কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার ৩০০ কিলোমিটার উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী (Costal-tidal Green belt)

বাংলাদেশে নিয়মিতভাবে ঋতু পরিবর্তনের সময় বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে ভূখণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। ঘরবাড়ি, বড়ো বড়ো গাছপালা ও প্রাণিসম্পদের প্রচুর ক্ষতিসাধন হয়। তাই ঝড়ের কবল থেকে ঘরবাড়ি, ফসল, কৃষিজমি ও বনাঞ্চল রক্ষার উদ্দেশ্যে পরিবেশতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় বৃক্ষ রোপণ করা যেতে পারে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে উপকূল বরাবর এবং প্রধান বায়ু প্রবাহের সমকোণে রোপিত একফালি শাখা-প্রশাখা সমৃদ্ধ বৃক্ষকে বায়ু প্রবাহ রোধক বেষ্টনী বা সবুজ বেষ্টনী বলে। আর যে একফালি ভূখণ্ডের ওপর সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয় সেই ভূ-খণ্ডকে আশ্রয় ফালি (Shelter belt) বলে। চিরহরিৎ বৃক্ষের উঁচু প্রজাতিগুলো সবুজ বেষ্টনী হিসেবে অধিক কার্যকর। তবে আশ্রয় ফালির শুধুমাত্র কেন্দ্রাংশ বরাবর সর্বোচ্চ বৃক্ষ রোপণ করতে হয় এবং তার উভয় পাশে ক্রমশ কম উচ্চতার বৃক্ষ, গুল্ম, উপগুল্ম ও তৃণলতা রোপণ করতে হয়। এর ফলে বনের ক্যানোপির (Canopy) প্রস্থচ্ছেদ ত্রিকোণাকার হয়।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা (Necessity of tidal green belt)

১। সবুজ বেষ্টনী সমুদ্র থেকে আসা জলোচ্ছ্বাসকে প্রাথমিকভাবে প্রতিহত করে এবং জলোচ্ছ্বাসের গতি, প্রচণ্ডতা ও উচ্চতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়।

২। জলোচ্ছ্বাসকালীন ভাটার টানে মানুষ, পশু ও অন্যান্য সম্পদ ভেসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

৩। ঝড়ের গতিবেগ, ঝাপটা ও ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

৪। বাসস্থান গভীর পানিতে তলিয়ে গেলে বৃক্ষের ওপর ওঠে মানুষ আত্মরক্ষা করতে পারে।

৫। সবুজ বেষ্টনীতে লাগানো বৃক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জ্বালানি, কাঠ, খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেতে পারে।

সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষের ধরন বা বৈশিষ্ট্য

১। উপকূলীয় অঞ্চল জোয়ারের পানিতে নিয়মিত সিক্ত হয় এবং পানি লবণাক্ত। একটু উঁচু জায়গায়ও মাঝে মাঝে জোয়ারের পানি ঢুকে যায়। কাজেই লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে পারে এমন বৃক্ষ প্রজাতি সবুজ বেষ্টনীর জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২। মূলতন্ত্রের মাধ্যমে মাটি ধরে রাখতে পারে এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৩। ঝড়ের ঝাপটায় ভেঙে না যায় বা মূলোৎপাটিত না হয় এমন প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে।

৪। সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ থেকে খাদ্য, পশুখাদ্য, পানীয়, জ্বালানি, কাঠ ও অন্যান্য অর্থকরী সম্পদ প্রাপ্তির সুবিধা থাকতে হবে।

কেওড়া, সুন্দরী, বাইন, রাইজোফোরা, পশুর, নারিকেল, সুপারি, গাব, বিলাতি গাব ইত্যাদি বৃক্ষ-প্রজাতি নির্বাচন করা যেতে পারে। মৃদু লবণাক্ত পানি এদের জন্য অসুবিধা হয় না। কেওড়া পাতা হরিণের প্রিয় খাদ্য, এর মূল মাটি ধরে রাখতে পারে, এ থেকে জ্বালানি ও কাঠ পাওয়া যায়। সুন্দরী থেকে কাঠ পাওয়া যায়। গাব থেকে জ্বালানি, মাছের জাল শক্ত করার উপাদান এবং খাওয়ার যোগ্য ফল পাওয়া যায়। এছাড়া গাব গাছ অত্যন্ত শক্ত, ঝড়ের ঝাপটা সামাল দিয়ে টিকে থাকতে পারে। ভেতরের দিকে লাগানো নারিকেল এবং সুপারি বাগান খাদ্য, পানীয় ও অর্থ যোগান দিতে পারে।

রেইনট্রি, গগন শিরিষের মতো কম শক্ত কাঠের বৃক্ষ নির্বাচন করা উচিত নয়। প্রচণ্ড ঝড়ে বা জলোচ্ছ্বাসে এরা নিজেরাই ভেঙে যায় এবং বসতবাড়ি, মানুষ ও পশুপাখির মৃত্যুহার বাড়িয়ে দেয়। এ জাতীয় বৃক্ষই ঝড়ের কবলে পড়ে ভেঙ্গে যায় এবং প্রচুর বাড়ি-ঘর ও মানুষের ক্ষতি হয়।

অর্থের লোভে যেন কেউ সবুজ বেষ্টনীর বৃক্ষ নিধন না করতে পারে সেদিকে সবার দৃষ্টি রাখতে হবে।

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় জীবের পরিচিতি

প্রকৃতিতে যে সকল জীব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) পূর্বে ছিল কিন্তু বর্তমানে তাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না সে সকল জীবদের বলা হয় **বিলুপ্ত জীব**। বিভিন্ন কারণে সময়ের ব্যবধানে কিছু কিছু প্রজাতি কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে এমনকি পৃথিবীর বুক থেকেও বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ধরনের বিলুপ্তিকে **নেপথ্য বিলুপ্তি** বলে। হঠাৎ করে পৃথিবীব্যাপী বিপুল সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার ইতিহাস আছে। এ ধরনের বিলুপ্তিকে বলা হয় **গণবিলুপ্তি** (mass extinction)। গণবিলুপ্তি পৃথিবীতে পাঁচ বার ঘটেছে। যে উদ্ভিদ বা প্রাণীকে নির্দিষ্ট প্রাণিভৌগোলিক অঞ্চলের বাইরে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না তাকে **এন্ডেমিক উদ্ভিদ বা এন্ডেমিক প্রাণী** বলে। ৪৫০ মিলিয়ন বছর আগে (অর্ডোভিসিয়ান যুগেরও শেষ দিকে) প্রথম গণবিলুপ্তি ঘটে যখন শতকরা ৮৫ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সর্বশেষ গণবিলুপ্তি ঘটেছে প্রায় ৭০-৮০ মিলিয়ন বছর আগে ক্রিটাসিয়াস যুগে যখন শতকরা ৭৬ ভাগ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর আর কোনো গণবিলুপ্তি ঘটেনি বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন জীব প্রজাতির উন্মেষ ঘটেছে।

জীববৈচিত্র্যের রেকর্ড শুরু হয় কার্যত ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে। এর পূর্বে কোনো দেশেরই জীববৈচিত্র্যের তালিকা তৈরি হয়নি, এখনও পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে যাদের জীববৈচিত্র্যের তালিকা করা সম্ভব হয়নি।

CamScanner

বর্তমানে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য সংকটে পড়েছে। তালিকাভুক্ত অনেক প্রজাতি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে এবং বহু প্রজাতি বিলুপ্ত প্রায় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনেক প্রজাতি আছে যা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হলেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলাদেশেও এমন অনেক জীব প্রজাতি আছে যা পূর্বে সচরাচর দেখা গেলেও এখন আর দেখা যায় না।

বাংলাদেশের কতিপয় বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ (বাংলাদেশে বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা শতাধিক)

শ্রেণি	বৈজ্ঞানিক নাম	স্বরূপ	প্রাপ্তিস্থান
ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ	১। *Psilotum triquetrum*	পরাশ্রয়ী	বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা
	২। *Tectaria chattagramica*	স্থলজ	চট্টগ্রাম
নগ্নবীজী উদ্ভিদ	১। *Cycas pectinata*	গুল্ম	চট্টগ্রাম, বাড়িয়াঢালা, গারো পাহাড়
	২। *Podocarpus nerifolia*	বৃক্ষ	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার
	৩। *Gnetum funiculare*	লতা গুল্ম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট
আবৃতবীজী উদ্ভিদ	১। *Aldrovanda vesiculosa* (মল্লিকা ঝাঁঝি)	জলজ, পতঙ্গভূক	রাজশাহী, পাবনা
	২। *Aquillaria agallocha* (আগর)	বৃক্ষ	পাথারিয়া বন-মৌলভীবাজার
	৩। *Corypha taliera* (তালিপাম)	তাল জাতীয় বৃক্ষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা
	৪। *Knema bengalensis* (ক্ষুদে বড়লা)	বৃক্ষ	ডুলাহাজরা-কক্সবাজার (এন্ডেমিক)
	৫। *Licuala peltata* (কোরুদ)	তালজাতীয় বৃক্ষ	চট্টগ্রাম, কাসালং-রাঙামাটি, সিলেট
	৬। *Rotala simpliciuscula* (রোট্যালা)	উভচর জাতীয় উদ্ভিদ	চট্টগ্রাম (এন্ডেমিক)
	৭। *Rosa involucrata* (জংলি গোলাপ)	জলজ, গুল্ম	সিলেট এর হাওর

* আগর বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে, তাই আর বিলুপ্তপ্রায় নয় এবং *Chlorophytum repalense* (বীরুৎ) উদ্ভিদটি বর্তমানে বাংলাদেশে আর পাওয়াই যাচ্ছে না। তালিপামটি এখন নাই, এর অনেক চারা বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও দু'টি চারা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। তালিপাম (Tali palm)

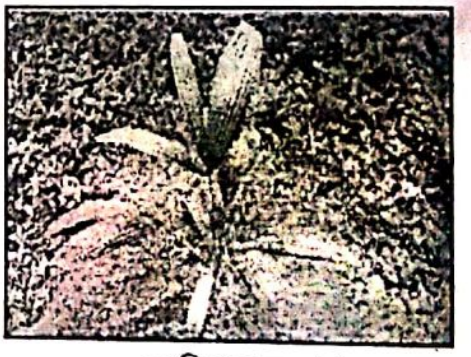

তালিপামের চারা

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের মধ্যে তালিপাম অন্যতম। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Corypha taliera* Roxb. গাছটি দেখতে প্রায় তাল গাছের মতোই, তাই এর বাংলা নাম হলো তালি বা তালিপাম। এটি Arecaceae (Palmae) গোত্রের অন্তর্গত।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনের কাছে অবস্থিত তালিপাম গাছটি ১৯৭৯ সালে কেটে ফেলার পর বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত তালিপাম গাছটিই ছিল বিশ্বের একমাত্র বন্য তালিপাম গাছ। তালিপাম জীবনে মাত্র একবারই ফুল ও ফল উৎপাদন করে এবং পরে তার মৃত্যু ঘটে। ঢাকার গাছটিও ২০১০ সালে ফুল ও ফল উৎপাদন শেষে ২০১২ সালে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে মৃত্যুর আগে গাছটি বহু ফল উৎপাদন করে গেছে যা থেকে অসংখ্য চারা করে বন বিভাগের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাগানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনের সামনেও একটি চারা লাগানো হয়েছে।

মঞ্জরীসহ তালিপাম (*Corypha taliera*)

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাঙ্গণের গাছ দু'টি অনেক বড়ো হয়েছে। স্যার এফ রহমান হল প্রাঙ্গণের চারা দু'টিও অনেক বড়ো হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের কোথাও বন্য অবস্থায় আর কোনো তালিপামের খবর জানা নেই। আমাদের লাগানো চারাগুলোর প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া আবশ্যক, যাতে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে এবং ৬০–৭০ বছর পর মৃত্যুর আগে প্রচুর ফল উৎপাদন করে যেতে পারে। বাংলার বাইরে এ গাছ নেই। এটি বৃহত্তর বাংলার এন্ডেমিক।

ড. আখতারুজ্জামান চৌধুরী চারা উৎপাদন করে বনবিভাগসহ বিভিন্ন স্থানে এর চারা লাগাতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। এর ফুল-ফল থেকে

১৩টি রাসায়নিক যৌগ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। যার ওপর গবেষণা করে তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আমরা ইতোমধ্যেই তালিপামের পুষ্পায়ন, বীজের অঙ্কুরোদগম, কচি ফলের বায়োক্যামিকেল বিশ্লেষণ, ব্যাক্টেরিয়া বিরোধী ক্ষমতা, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট গুণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা শেষে ফলাফল প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি, যা আগামী ৬০–৭০ বছরে আর সম্ভব হবে না। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে টাঙ্গাইল সার্কিট হাউসে লাগানো গাছটিতে (১৭ জুন ২০১২ সালে লাগানো) ফুল এসেছে, বীজও হচ্ছে।

২। মল্লিকা ঝাঁঝি (Malacca Jhangi)

মল্লিকা ঝাঁঝি বাংলাদেশের আরেকটি বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Aldrovanda vesiculosa* Linn. এবং গোত্র Droseraceae। মল্লিকা ঝাঁঝি একটি জলজ উদ্ভিদ এবং পতঙ্গভুক উদ্ভিদ। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মল্লিকা ঝাঁঝি পাওয়া যায় ১৯৭৪ সালে রাজশাহীর পটিয়া উপজেলার অন্তর্গত একটি বিল থেকে। পরবর্তীতে চলন বিল (পাবনা) থেকেও একবার সংগ্রহ করা হয়েছিল কিন্তু এর পর আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো জায়গা থেকে মল্লিকা ঝাঁঝি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এটি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলোতে সতর্ক পর্যবেক্ষণে হয়ত কেউ এটি পেয়েও যেতে পারেন। অবশ্য এশিয়া, আফ্রিকা, সেন্ট্রাল ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়াতেও মল্লিকা ঝাঁঝি জন্মে থাকে।

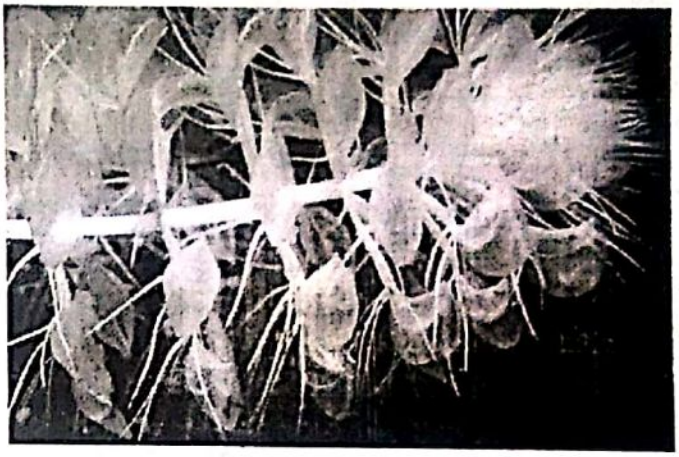

মল্লিকা ঝাঁঝি (*Aldrovanda vesiculosa*)

৩। ক্ষুদে বড়লা (Khude barala)

ক্ষুদে বড়লা বাংলাদেশের একটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ। বাংলাদেশে এন্ডেমিক অর্থ হলো বাংলাদেশের বাইরে অন্য কোনো দেশে এখনো এটি পাওয়া যায়নি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Knema bengalensis* de Wilde, গোত্র Myristicaceae। এ উদ্ভিদটি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করা হয় ১৯৫৭ সালে কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরা বনাঞ্চল থেকে। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে কক্সবাজার জেলার আপার রিজু বনবিট অফিসের কাছে একটি গাছের সন্ধান পাওয়া যায়।

ক্ষুদে বড়লা (*Knema bengalensis*)

ক্ষুদে বড়লা একটি মধ্যম আকারের বৃক্ষ, কাণ্ডে ক্ষত হলে রক্ত বর্ণের কষ বের হতে থাকে। ক্ষুদে বড়লার পুরুষ ও স্ত্রী বৃক্ষ পৃথক। এখনো কোনো স্ত্রী বৃক্ষের সন্ধান পাওয়া যায় নি। আপার রিজু অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে এর স্ত্রী বৃক্ষ আবিষ্কার করতে হবে এবং ঐ বৃক্ষ থেকে বীজ সংগ্রহ করে চারা করার মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাতে হবে অথবা টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা করতে হবে। এর সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

৪। কোরুদ (Kurud)

কোরুদ একটি পামজাতীয় উদ্ভিদ যা চট্টগ্রাম, রাঙামাটি (কাসালং) এবং সিলেটের গহীন বনে জন্মে থাকে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Licuala peltata* Roxb। গোত্র Arecaceae. এটি ছোটো আকৃতির গাছ, মাত্র ২-৩ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। এর পাতা দিয়ে এক রকম ছাতা তৈরি করা হয়, আবার ঘরের ছাউনিও দেয়া হয়। বাংলাদেশের বাইরে মিয়ানমার এবং ভারতের বিহার, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বর্তমানে এটি দ্রুত কমে যাচ্ছে। এর ইন-সিটু ও এক্স-সিটু উভয় প্রকার সংরক্ষণ অতি জরুরি। বন বিভাগ এ দিকে নজর দিবেন আশা করি।

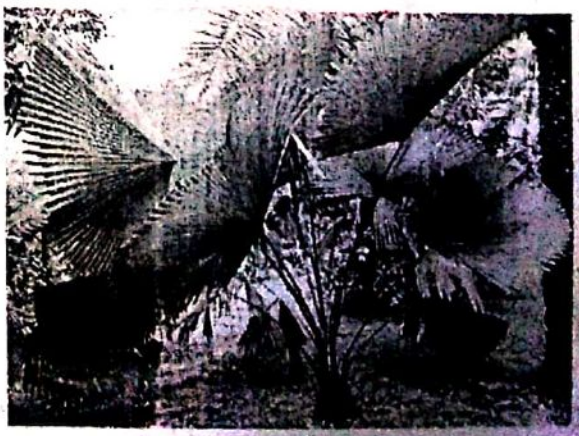

কোরুদ (*Licuala peltata*)

৫। রোট্যালা (Rotala)

রোট্যালা বাংলাদেশের একটি এন্ডেমিক উদ্ভিদ। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Rotala simpliciuscula* (S. Kurz) Koehne (1880), গোত্র Lythraceae. বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে এটি সংগ্রহ করেছিলেন হুকার ও থমসন (Hooker and Thomson) এবং সেই নমুনার ওপর ভিত্তি করে S. Kurz এর নামকরণ করেছিলেন *Ammannia simpliciuscula* Kurz (1871)।

রোট্যালা একটি উভচর জাতীয় উদ্ভিদ, জলসিক্ত স্থানে জন্মে থাকে। তবে হুকার ও থমসনের সংগ্রহের পর আর দ্বিতীয় বার সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, কাজেই এটি বাংলাদেশ থেকে এমনকি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে অনুমান করা যায়।

আমাদেরকে এ গাছটিকে খুঁজতে হবে এবং পাওয়া গেলে ইন-সিটু এবং এক্স-সিটু উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোট্যালা (*Rotala simpliciuscula*)

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় (বিপদাপন্ন) কয়েকটি প্রাণী (Endangered Animals)

সাধারণ নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	শ্রেণি	প্রাপ্তিস্থান
রাজশকুন	*Sarcogyps calvus*	Aves	রাজশাহী, সিলেট
ঘড়িয়াল	*Gavialis gangeticus*	Reptilia	পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র
মিঠাপানির কুমির	*Crocodylus palustris*	Reptilia	সুন্দরবন
নীলগাই	*Boselaphus tragocamelus*	Mammalia	দিনাজপুর (তেঁতুলিয়া অঞ্চল)
শুশুক	*Platanista gangetica*	Mammalia	পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র
তক্ষক	*Gekko gecko*	Reptilia	প্রায় সর্বত্র
রাজ ধনেশ	*Buceros bicornis*	Aves	সিলেট
উল্লুক	*Hylobates hoolock*	Mammalia	সিলেট
লজ্জাবতী বানর	*Nycticebus coucang*	Mammalia	সিলেট
হাতি	*Elephas maximus*	Mammalia	সিলেট, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় কয়েকটি প্রাণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। রাজশকুন (Red-headed vulture)

রাজশকুন বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই একটি বিপন্ন পাখি, বাংলাদেশে এটি মহাবিপন্ন বলে চিহ্নিত। এটি বাংলাদেশের প্রাক্তন আবাসিক পাখি, তবে বর্তমানে আর দেখা যায় না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর বিস্তৃতি।

রাজশকুনের বৈজ্ঞানিক নাম *Sarcogyps calvus* (Scopoli, 1786); ইংরেজি নাম Red-headed Vulture or King Vulture. এর মাথা লাল, পালক কাল। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা অভিন্ন। অন্যান্য শকুনের মতো এরা দলবদ্ধ নয়, একা বা জোড়ায় দেখা যায়। খাবারের তালিকায় মৃত পশুর দেহ। উঁচু গাছের ডালে পাতা দিয়ে বাসা বানায় এবং একটি মাত্র ডিম পাড়ে। ৪৫ দিনে ডিম ফোটে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী আইনে এটি সংরক্ষিত প্রজাতি।

রাজশকুন (*Sarcogyps calvus*)

২। ঘড়িয়াল (True gavial)

ঘড়িয়াল বাংলাদেশে একটি অতি বিপদাপন্ন সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশে এটি প্রায় বিলুপ্ত, যদিও ভারতের উজান থেকে আসা ঘড়িয়াল কদাচিৎ নদীতে দেখা যায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Gavialis gangeticus* (Gmelin, 1789).

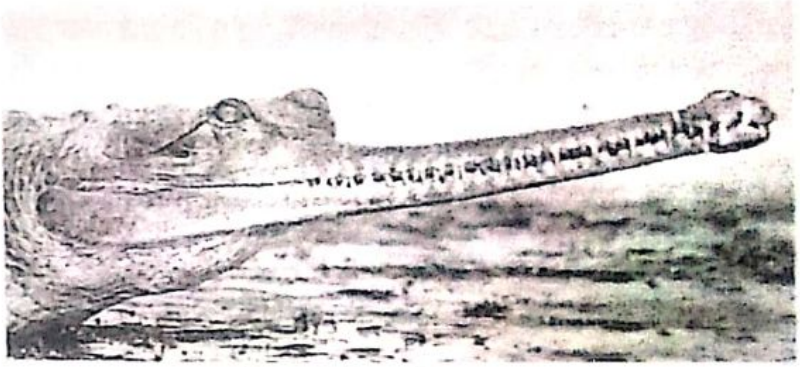

ঘড়িয়াল (*Gavialis gangeticus*)

ঘড়িয়াল পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক, পুরুষ ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৬.৫ মিটার এবং স্ত্রী ঘড়িয়ালের দৈর্ঘ্য ৪.৫ মিটার। ঘড়িয়াল গভীর ও দ্রুত প্রবাহমান পানিতে বাস করে। এদের প্রধান খাদ্য মাছ। নভেম্বর-জানুয়ারি এদের প্রজনন মাস। স্ত্রী ঘড়িয়াল বালুতে তৈরি গর্তে ৩০–৫০টি ডিম পাড়ে। ডিম অনেক বড়ো। ৩ মাস তা দেয়ার পর ডিম থেকে বাচ্চা হয়।

এদেরকে ব্রহ্মপুত্র নদে (ভারত ও ভুটান), সিন্ধু নদ (পাকিস্তান), গঙ্গা নদী (ভারত ও নেপাল) এবং মহানদীতে (ভারত) পাওয়া যায়। মিয়ানমার ও পাকিস্তানেও এ প্রজাতি প্রায় বিলুপ্ত।

সাধারণত জেলেদের মাছ ধরার জালে আটকা পড়ে এদের জীবনাবসান ঘটে এবং এটি বিলুপ্তির একটি বড়ো কারণ। এ ব্যাপারে অবশ্যই জেলেদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

৩। মিঠাপানির কুমির (Freshwater crocodyle)

মিঠাপানির কুমির বাংলাদেশে বিলুপ্ত, প্রাকৃতিকভাবে আর দেখা যায় না। বাগেরহাটের খান জাহান আলী (র) মাজারের সাথের পুকুরে কয়েকটি কুমির আছে। সম্প্রতি ভারত থেকে সাফারি পার্কে পালনের জন্য কয়েকটি কুমির আনা হয়েছে। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Crocodylus palustris* (Lesson, 1768)।

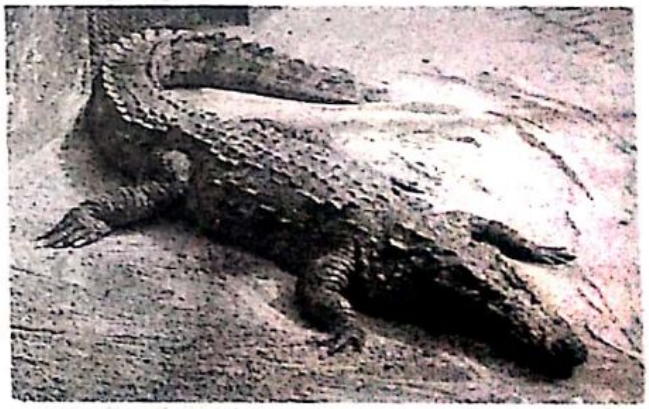

মিঠাপানির কুমির (*Crocodylus palustris*)

প্রাপ্তবয়স্ক কুমিরের দেহের দৈর্ঘ্য ৩–৫ মিটার। এরা নদী, পুকুর ইত্যাদি মিঠা পানিতে বাস করে, সাধারণত জোয়ার-ভাটা এলাকায় প্রবেশ করে না। এরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। এরা নদীর তীরে গর্তে ডিম পাড়ে, ৫০–৫৫ দিনে ডিম ফোটে। যে কয়টি মিঠাপানির কুমির এখন বাংলাদেশে আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৪। নীলগাই (Nilgai)

নীলগাই বাংলাদেশের আর একটি বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ী প্রাণী। ১৯৪০ সালের দিকে বর্তমান বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া অঞ্চলে নীলগাই পাওয়া যেতো বলে জানা যায়। ধারণা করা হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে এরা বিলুপ্ত। এরা সমতল ভূমিতে বাস করে। নীলগাই-এর বৈজ্ঞানিক নাম *Boselaphus tragocamelus* (Pallas, 1766)। প্রজনন সময় ছাড়া সাধারণত বছরের অন্যান্য সময় ষাঁড় ও গাভী পৃথকভাবে বিচরণ করে। গাভীর লোম হলুদ-বাদামি, প্রাপ্তবয়স্ক ষাঁড়ের লোম নীল-ধূসর। ৪ সেপ্টেম্বর (২০১৮) ঠাকুরগাঁও এর রানীশংকৈল থেকে স্থানীয়রা একটি গর্ভবতী নীলগাই উদ্ধার করে। বনবিভাগ সেই নীলগাইটিকে রামসাগর জাতীয় উদ্যানে নিয়ে এসেছে। আঘাতপ্রাপ্ত থাকার কারণে গর্ভপাতের পর বাচ্চাটি মারা যায় তবে মা নীলগাইটিকে সুস্থ করে তোলা হয়েছে। এখন এটি

নীলগাই (*Boselaphus tragocamelus*)

CamScanner

রামসাগর জাতীয় উদ্যানেই আছে। এর কিছুদিন পর নওগাঁর মান্দা উপজেলার জোতবাজার এলাকায় একটি পুরুষ নীলগাই ধরা পড়ে। এদেরকে একসাথে রামসাগর জাতীয় উদ্যানে রাখা হয়েছিল। কিন্তু মা নীলগাইটির মৃত্যু হয়েছে গত ১৭ মার্চ ২০১৯ সালে অপঘাতে। এরই মধ্যে আরেকটি পুরুষ নীলগাই ধরা পড়েছে। ১ আগস্ট ২০২১ শ্রীপুর বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে জন্ম নিয়েছে নীলগাই-এর ২টি শাবক। মেয়ে নীলগাইটি চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকষা এলাকা থেকে উদ্ধার করে গত ২১ ফেব্রুয়ারি সাফারি পার্কে দিয়েছিলেন বিজিবি। পরে রামসাগর জাতীয় উদ্যান থেকে পুরুষ নীলগাইটি এনে এখানে রাখা হয়। ধারণা করা হচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারলে বিলুপ্তির হাত থেকে এরা রক্ষা পাবে।

৫। শুশুক (River dolphin)

শুশুক একটি স্তন্যপায়ী জলজ প্রাণী। বাংলাদেশে শুশুক এখন বিপন্ন প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। সাধারণত এরা উপকূল ও সমুদ্রে বিচরণ করে। বর্ষায় বড়ো বড়ো নদী দিয়ে অনেক ভেতরেও চলে আসে। বাংলাদেশে দু'ধরনের শুশুক পাওয়া যায়, একটির বৈজ্ঞানিক নাম *Orcaella brevirostris* এবং অপরটির বৈজ্ঞানিক নাম *Neophocaena phocaenoides*। দ্বিতীয়টির পিঠে পাখনা নেই। এরা মাঝে মাঝে পানি থেকে ওপরে লাফ দেয় এবং দল বেঁধে চলে। মাছ এদের প্রধান খাদ্য। এরা শুশুক মাছ, শিশু বা শিশু মাছ, হউম মাছ, হচ্ছুম মাছ ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত।

শুশুক *(Orcaella brevirostris)*

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

পৃথিবীতে প্রায় ৩০ লক্ষ প্রজাতির জীব ও অণুজীব রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এ যাবৎ শনাক্ত হয়েছে মাত্র ১৭.৫ লক্ষ প্রজাতির জীব। প্রকৃতিতে প্রত্যেকটি প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা রয়েছে। জীববৈচিত্র্য হলো জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন আঙ্গিকের পার্থক্য। Bio অর্থ জীব, diversity অর্থ ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য। কাজেই Biodiversity এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে জীববৈচিত্র্য। T.E. Lovejoy (1980) তাঁর "Changes in Biological Diversity" প্রবন্ধে এবং E. A. Norse and R.E. McManus (1980) তাঁর "Ecology and Living resources–Biological Diversity" প্রবন্ধে প্রথম Biological Diversity শব্দ প্রয়োগ করেন। বিজ্ঞানী Walter G. Rosen (1986) সর্বপ্রথম Biological Diversity এর সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবে Biodiversity শব্দটি ব্যবহার করেন। **অধ্যাপক Hamilton এর মতে, পৃথিবীর মাটি, পানি ও বায়ুতে বসবাসকারী সব উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবদের মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও পরিবেশগত (বাস্তুতান্ত্রিক) বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকেই জীববৈচিত্র্য বলে।** UNCED (1992) এর সংজ্ঞানুযায়ী–পৃথিবীর স্থলজ, সামুদ্রিক ও অন্যান্য বাস্তুতন্ত্র এবং এর সম্পর্কিত সকল স্তরের সদস্য হিসেবে বসবাসকারী জীবদের মধ্যে বিদ্যমান সকল ধরনের বৈচিত্র্যই জীববৈচিত্র্য।

বাংলাদেশে ভাস্কুলার উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। ২০০১ সালের রেড ডাটা বুক অনুযায়ী ১০৬টি বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশে ৬৫০টি প্রজাতির পাখির মধ্যে ১২টি প্রজাতি বিলুপ্ত আর ৩০টি প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। ৩৪টি উভচর প্রাণীর মধ্যে ৮টি, ১৫৪টি সরীসৃপের মধ্যে ১৪টি প্রায় বিলুপ্তির পথে। যেমন— সুন্দরবন অঞ্চল থেকে বুনোমহিষ, সোয়াম্প হরিণ, হগ হরিণ, গণ্ডার, চিতা বাঘ ও গাউর পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সারাবিশ্বে ১০–৩৭% জীব আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ৫০% শৈবাল ধ্বংস হয়ে যাবে। বর্তমানে প্রতি বছরে জীব প্রজাতির বিলুপ্তির হার হলো ২৭,০০০ (০.৫%)।

জীব বিলুপ্তির কারণ (Causes of extinction of organism)

বহুবিধ কারণে বিভিন্ন জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে এবং আরও অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে রয়েছে। জীব বিলুপ্তির প্রধান প্রধান কারণসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

(ক) ইকোলজিক্যাল কারণ

১। **কম পপুলেশন ও কম বিস্তৃতি অঞ্চল :** কোনো প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা কম হলে এবং বিস্তৃতি অঞ্চল সংকীর্ণ হলে তার বিলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

২। **গুচ্ছ বণ্টন :** স্থানে স্থানে গুচ্ছবণ্টিত জীব প্রজাতির সহজে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। **বড়ো দেহ এবং খাদ্যশৃঙ্খলে ওপরে অবস্থান :** খাদ্যশৃঙ্খলে যার অবস্থান যত ওপরে তার বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

৪। **কলোনিকরণের অক্ষমতা :** যেসব প্রজাতি নতুন পরিবেশে বংশবিস্তারের মাধ্যমে কলোনি সৃষ্টি করতে পারে না সে সব প্রজাতি সহজে বিলুপ্ত হয়।

৫। **পরিবেশীয় নিয়ামকের অস্থিরতা :** পরিবেশীয় নিয়ামক (খাদ্য সরবরাহ, আবহাওয়া ইত্যাদি) সমূহের অস্থিরতায় দুর্লভ প্রজাতিগুলো টিকে থাকতে পারে না।

৬। **প্রাকৃতিক বিপর্যয় :** ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, হিমবাহ, ভূমিধস, টর্নেডো, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি কারণে সহজেই দুর্লভ প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

(খ) **মানব সৃষ্ট কারণ :** বর্তমানকালে মানুষের কার্যকলাপই প্রজাতি ধ্বংসের মূল কারণ।

১। **বাসস্থান ধ্বংস :** জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো তাদের বাসস্থান ধ্বংস। বর্তমানে প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ৫০ একর বাসস্থান ধ্বংস হচ্ছে। জলাভূমি ভরাট জলজ প্রজাতি বিলুপ্তির প্রধান কারণ।

২। **এক্সপ্লয়টেশন :** সম্পদের অতিমাত্রায় আহরণ বহু জীব প্রজাতি বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩। **অতিমাত্রায় পশুচারণ :** তৃণভূমিতে অতিমাত্রায় পশুচারণের ফলে অনেক প্রজতি বিলুপ্তির পথে।

৪। **পলিনেটর ধ্বংস :** মৌমাছিসহ বহু কীটপতঙ্গ উদ্ভিদের পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে। অতিমাত্রায় কীটনাশক, পতঙ্গনাশক ব্যবহারের ফলে পরাগায়নের এ বাহকগুলো কমে গিয়েছে, ফলে পরাগায়নের অভাবে প্রজাতি বিলুপ্তির পথে রয়েছে।

৫। **পরিবেশ দূষণ :** পরিবেশ দূষণ জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির একটি বড়ো কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Importance of conserving endangered species)

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রথম নীতিমালা হলো **"জীবের প্রতিটি ধরনই অনন্য এবং সমাজ বা মানবতার কাছ থেকে ন্যায্যতার দাবিদার।"** এ নীতিমালার আলোকে কেবল বিলুপ্তপ্রায় জীব নয়, সকল জীব প্রজাতিকে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। প্রতিটি জীব তার পরিবেশের একটি উপাদান এবং এর সাথে পরিবেশের অন্যান্য নিয়ামকের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেবল একটি জীব প্রজাতি নয়, একটি জীব প্রজাতির কোনো একটি ইনডিভিজুয়েলের বিলুপ্তিও পরিবেশের ওপর কিঞ্চিৎ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এ প্রতিক্রিয়া সম্মিলিতভাবে একদিন পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। কাজেই সঠিকভাবে সকল প্রজাতির জীবকে সংরক্ষণ করতে হবে।

আমাদের অসচেতনতার কারণে ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে আছে হাজার হাজার প্রজাতি। এখনই সংরক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে এগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

যে জীব প্রজাতিগুলো সহসা বিপদাপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নেই সেগুলোও সংরক্ষণের তালিকায় রাখতে হবে, তবে এখন সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রতি। পৃথিবীর বুক থেকে একবার বিলুপ্ত হয়ে গেলে আর তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না। এখনো সকল জীব প্রজাতির উপকারী দিক আমাদের জানা সম্ভব হয়নি, হয়তো দেখা যাবে আজকের এ বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিটি হতেই ভবিষ্যতে আমার কোনো বংশধরের জীবন রক্ষাকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হবে। বিলুপ্তপ্রায় কোনো জীব প্রজাতির মধ্যে এমন একটি 'জিন' থাকতে পারে যাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বহুদূর এগিয়ে যেতে পারবে; ঘটাতে পারবে কৃষি বিপ্লব বা শিল্প বিপ্লব। কাজেই আমরা পৃথিবীর বুক থেকে একটি জীব প্রজাতিও আর হারিয়ে যেতে দেবো না।

মনে রাখতে হবে এমনিতেই কোনো জীব প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে এগোয়নি। এর পেছনে বহু যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। প্রথমেই ঐ কারণগুলো জানতে হবে। প্রতিটি জীবের নিজস্ব পরিবেশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ঐ রকম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এরূপ প্রতিটি জীবের বংশবিস্তার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে হবে। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা যায় কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সব রকম অসুবিধা দূর করে এবং সব রকম সুবিধা প্রদান করে আমরা বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতিগুলোকে পৃথিবীর বুকে কেবল টিকিয়েই রাখবো না, এদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করবো।

সামগ্রিকভাবে বিলুপ্তপ্রায় জীব প্রজাতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে নিম্নলিখিত বিষয় অনুযায়ী দেখা যায়।

(১) কৃষিজজীব ও তাদের বন্যআত্মীয় সংরক্ষণ, (২) ভেষজউদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষণ, (৩) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, (৪) ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ, (৫) অগ্রসরমান অর্থনীতি সংরক্ষণ, (৬) নান্দনিকতা সংরক্ষণ এবং (৭) প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার অধিকার সংরক্ষণ।

কাজ : বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি চার্ট তৈরি করো।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Biodiversity conservation)

বিশ্বকে মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে এগিয়ে এসেছে, শুরু হয়েছে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজ। জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোই **হটস্পট** নামে পরিচিত।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ তথা কনজারভেশন বলতে বোঝায় বর্তমান জীবকুলের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, যাতে করে একদিকে বর্তমান প্রজন্ম তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারবে এবং অপরদিকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও যেন এমনিভাবে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী জীববৈচিত্র্য ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা সমুন্নত থাকবে।

অন্যভাবে বলা যায়, কনজারভেশন হলো মানুষ কর্তৃক জীবমণ্ডলের ব্যবহার সংক্রান্ত এমন ব্যবস্থাপনা যাতে করে জীবমণ্ডল বর্তমান প্রজন্মের জন্য সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রায় সুফল প্রদান করতে পারে অথচ একই সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহের সকল প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের সম্ভাবনাও সমভাবে অক্ষুণ্ন থাকে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (preservation), রক্ষণাবেক্ষণ (maintenance), সহনীয় মাত্রায় প্রয়োগ (sustainable utilization), পুনরুদ্ধার (restoration) এবং ব্যবহারের (using biodiversity) মাধ্যমে গঠিত সমন্বিত ব্যবস্থাপনাকে বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন বা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলে।

বাংলাদেশের সংরক্ষিত অঞ্চল (Protected Areas of Bangladesh) : সরকারি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে (চ্যাপ্টার iv এর ১৩, ১৭, ১৮, ১৯ ধারা অনুযায়ী) সংরক্ষিত অঞ্চল (বনাঞ্চল) ঘোষণা করা হয়। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। সব অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, সাফারি পার্ক, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং ট্রাডিশনাল হেরিটেজ অঞ্চল 'সংরক্ষিত অঞ্চলের' অন্তর্ভুক্ত।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের পদ্ধতিসমূহ : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রধানত দু'প্রকার; যথা- (ক) ইন-সিটু সংরক্ষণ এবং (খ) এক্স-সিটু সংরক্ষণ।

(ক) প্রাকৃতিক বাসস্থানে সংরক্ষণ বা ইন-সিটু সংরক্ষণ (In-situ conservation) : মূল বাসস্থানে তথা প্রাকৃতিক পরি .শের বিবর্তনীয় গতিশীল ইকোসিস্টেমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করাকে বলা হয় ইন-সিটু সংরক্ষণ।

সুন্দরবনের কর্দমাক্ত, লবণাক্ত ও সিক্ত পরিবেশে সুন্দরী গাছ জন্মে থাকে। কাজেই সুন্দরী গাছকে সুন্দরবনের মূল বাসস্থান তথা ঐ পরিবেশতন্ত্রে সংরক্ষণ করাই হলো ইন-সিটু সংরক্ষণ বা স্বস্থানে সংরক্ষণ এর একটি উদাহরণ।

ইন-সিটু সংরক্ষণের সুবিধাসমূহ

(i) কোনো প্রজাতি সংরক্ষণের সবচেয়ে উত্তম উপায় হলো যে বাসস্থানে ইহা প্রাকৃতিকভাবে জন্মে সেই বাসস্থানকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। এর ফলে উক্ত প্রজাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রাণিকুলও সংরক্ষিত হয়।

CamScanner

(ii) অনেক উদ্ভিদ তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও অন্যান্য কারণে তাদের মাইকোরাইজাল ছত্রাকের ওপর নির্ভরশীল। ইন-সিটু সংরক্ষণের ফলে মাইকোরাইজাল ছত্রাকও সংরক্ষিত হয় এবং ঐ উদ্ভিদের টিকে থাকা নিশ্চিত হয়।

(iii) একটি প্রজাতি বা একটি উদ্ভিদ কেবলমাত্র একটি ইকোসিস্টেমের অংশই নয়, ইহা বিভিন্নভাবে আশপাশের অন্যান্য প্রজাতির সাথে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে এবং অনেক প্রজাতিকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। ইন-সিটু সংরক্ষণে এ সুবিধা থাকে।

(iv) কোনো প্রজাতিকে তার বাসস্থানে সংরক্ষণের সবচেয়ে উপকারী দিক হলো এই যে, এতে করে বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াগুলো চালু থাকে।

(v) যে দেশ বা অঞ্চলে ফ্লোরা এখনো ভালোভাবে তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি অথবা বিশদভাবে স্টাডি করা সম্ভব হয়নি সে দেশ বা সে অঞ্চলে ইন-সিটু সংরক্ষণ আবশ্যক। অনেক দেশেই সংকটাপন্ন প্রজাতির (endangered species) তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন হয়নি, সেসব দেশে এক্স-সিটু অবস্থানে কোন কোন প্রজাতি সংরক্ষণ করতে হবে তাও সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়নি। কাজেই ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ করা তথা ইন-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতিই সেখানে আদর্শ সংরক্ষণ পদ্ধতি।

(vi) যে অঞ্চলে এখনো অনেক প্রজাতি অনাবিষ্কৃত রয়েছে সে অঞ্চলেও ইন-সিটু সংরক্ষণ পদ্ধতি আবশ্যক।

(vii) রিক্যালসিট্র্যান্ট (recalcitrant) বীজ সংরক্ষণের জন্য ইন-সিটু পদ্ধতি বিশেষভাবে উপযোগী।

ইন-সিটু সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যমগুলো নিম্নরূপ :

১। ন্যাশনাল পার্ক (National Park) বা জাতীয় উদ্যান : ন্যাশনাল পার্ক বলতে বোঝায় প্রাকৃতিকভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনামূলকভাবে বৃহৎ অঞ্চল যেখানে বন্যজীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সুরক্ষিত থাকবে। গবেষণা ও বিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশ করা যায়। বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ন্যাশনাল পার্ক হলো—

বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ন্যাশনাল পার্ক (জাতীয় উদ্যান)

সংরক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১। ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক	গাজীপুর	৫০২২	১৯৮২
২। মধুপুর "	টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ	৮৪৩৬	১৯৮২
৩। রামসাগর (সবচেয়ে ছোটো) "	দিনাজপুর	২৭.৭৫	২০০১
৪। হিমছড়ি (সর্বপ্রথম) "	কক্সবাজার	১৭২৯	১৯৮০
৫। লাউয়াছড়া "	মৌলভীবাজার	১২৫০	১৯৯৬
৬। কাপ্তাই "	রাঙ্গামাটি	৫৪৬৪	১৯৯৯
৭। নিঝুমদ্বীপ (সবচেয়ে বড়ো) "	নোয়াখালী	১৬৩৫২	২০০১
৮। মেধাকচ্ছপিয়া "	কক্সবাজার	৩৯৫	২০০৮
৯। সাতছড়ি "	হবিগঞ্জ	২৪২	২০০৪
১০। খাদিমনগর "	সিলেট	৬৭৮	২০০৬
১১। বাড়ইভালা "	চট্টগ্রাম	২৯৩৩	২০১০
১২। নবাবগঞ্জ "	দিনাজপুর	৫১৭	২০১০
১৩। সিংগ্রা "	দিনাজপুর	৩০৫	২০১০
১৪। কাদিগড় "	ময়মনসিংহ	৩৪৪	২০১০
১৫। আলতাদিঘি "	নওগাঁ	২৬৪	২০১১
১৬। বীরগঞ্জ "	দিনাজপুর	১৬৮	২০১১

২। ইকোপার্ক (Ecopark) : ইকোলজিক্যাল পার্ক-এর সংক্ষিপ্তরূপ ইকোপার্ক। প্রাকৃতিক পরিবেশকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রেখে এবং সেখানকার জীববৈচিত্র্যের কোনো প্রকার ক্ষতি না করে চিত্তবিনোদনের সব ব্যবস্থা করা হয় ইকোপার্কে।

CamScanner

সাধারণত প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত বনাঞ্চলের অংশবিশেষকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এনে ইকোপার্ক তৈরি করা হয়। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফ্লোরাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইকোপার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

(i) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (ii) বিলুপ্ত ও দুর্লভ উদ্ভিদ সংরক্ষণ, (iii) বিরাজমান জীববৈচিত্র্য ও তাদের বাসস্থান সংরক্ষণ, (iv) বিশেষ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের ব্রিডিং ও উন্নয়ন, (v) পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামো নির্মাণ, (vi) স্থানীয় বাসিন্দাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং (vii) শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইকোপার্ক

(a) সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক : সীতাকুণ্ড উপজেলা, চট্টগ্রাম। ঐতিহাসিক চন্দ্রনাথ পাহাড় ও মন্দিরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আয়তন ১৯৯৬ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৯। প্রাকৃতিকভাবে *Cycas* এখানে জন্মে থাকে। প্রায় ১৫৪ প্রজাতির উদ্ভিদ এখানে পাওয়া যায়।

(b) মধুটিলা ইকোপার্ক : নালিতাবাড়ি উপজেলা, শেরপুর। বাংলাদেশ-ভারতের বর্ডার সংলগ্ন গারো পাহাড়ের পাদদেশে এটি অবস্থিত। আয়তন ৩৮০ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৯। ঘন বন, পাহাড়, ঝর্ণা, লেক এবং বহু টিলা নিয়ে এ পার্ক গঠিত।

(c) মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক : বড়লেখা উপজেলা, মৌলভীবাজার এবং পাথারিয়া হিল-রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত। আয়তন ৫০০ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০১ সাল। দৃষ্টিনন্দন মাধবছড়া ঝর্ণা এখানে অবস্থিত। দুর্লভ দোলিচাঁপা বৃক্ষ এখানে দেখা যায়।

(d) বাঁশখালি ইকোপার্ক : বাঁশখালি উপজেলা, চট্টগ্রাম। জলদি অভয়ারণ্য রেঞ্জের বামের ছড়া ও ডানের ছড়া এলাকা নিয়ে এ ইকোপার্ক গঠিত। আয়তন প্রায় ৩০০০ একর। এ পার্বত্য এলাকায় বহু দৃষ্টিনন্দন কাঠামো (লেক, ঝুলন্ত সেতু) এবং হাতি, ভাল্লুক, হরিণ, অজগর দেখা যায়। প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৩ সাল।

(e) কুয়াকাটা ইকোপার্ক : পটুয়াখালির কলাপাড়া উপজেলা এবং বরগুনার আমতলি উপজেলার অংশ নিয়ে কুয়াকাটা ইকোপার্ক গঠিত। প্রায় ১৩ হাজার একর আয়তনের এ বিশাল ইকোপার্ক ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কুয়াকাটা সাগর সৈকত এবং ম্যানগ্রোভ বন এ ইকোপার্কের অন্তর্ভুক্ত। পর্যটকদের জন্য সুব্যবস্থা আছে।

(f) টিলাগড় ইকোপার্ক : সিলেট কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ের কাছে রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে টিলাগড় ইকোপার্ক গঠিত। অয়তন ১১২ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৬ সাল।

(g) জাফলং ইকোপার্ক : সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার কৌলাখাল রিজার্ভ ফরেস্টের অংশবিশেষ নিয়ে এ ইকোপার্ক গঠিত। সিলেট-তামাবিল হাইওয়ের দু'পাশে স্ট্রিপ গার্ডেন (strip gardens) করে দেয়া হয়েছে।

(h) বঙ্গবন্ধু যমুনা ইকোপার্ক : বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতুর পশ্চিম পাশে এটি বনবিভাগ কর্তৃক সৃজন করা ইকোপার্ক। আয়তন ১২৪ একর, প্রতিষ্ঠাকাল ২০০৭ সাল।

(i) বর্শিজোড়া ইকোপার্ক : মৌলভীবাজার শহরের কাছে রিজার্ভ ফরেস্টের ৮৮৭ একর জায়গা নিয়ে ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ ইকোপার্ক। এখানে অবজার্ভেশন টাওয়ার, ইকো-কটেজ, পিকনিক স্পট এবং প্রচুর টিম্বার ও ভেষজ উদ্ভিদ আছে।

৩। সাফারি পার্ক (Safari Park) : সাফারি পার্ক এক ধরনের সংরক্ষিত বনভূমি যেখানে বন্য প্রাণীরা (হিংস্র প্রাণীসহ) ন্যূনতম প্রাকৃতিক পরিবেশে রক্ষিত থাকে, মুক্তাবস্থায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করে এবং দর্শনার্থীগণ বিশেষ বাহনে অবরুদ্ধ থেকে তাদের গতিপ্রকৃতি অবলোকন করে আনন্দ লাভ করে সে পার্ক হলো সাফারি পার্ক। সাফারি পার্কে দেশের নিজস্ব এবং বিদেশ থেকে আনা বন্যপ্রাণী প্রাকৃতিক পরিবেশে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হয়। প্রাণীরা এখানে মুক্তভাবে ব্রিডিং করতে পারে। সাফারি পার্কের উদ্দেশ্য হলো : (i) ইকোট্যুরিজম, (ii) বিনোদন, (iii) কনজার্ভেশন এবং গবেষণা, (iv) জনগণের মধ্যে সংরক্ষণ সচেতনতা সৃষ্টি। বাংলাদেশে দুটি সাফারি পার্ক আছে। যথা–

(i) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলাহাজরা। এটি ডুলাহাজরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক নামেও পরিচিত। এর আয়তন প্রায় ২২২৪ একর। উপজেলা চকোরিয়া, জেলা কক্সবাজার। প্রতিষ্ঠা ১৯৯৯ সাল।

এখানে ১৬৫ প্রজাতির প্রায় ৪০০০ প্রাণী আছে। উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের মধ্যে গর্জন, বৈলাম, তেলসুর প্রধান। প্রাণীর মধ্যে অধিক সংখ্যায় হাতি আছে, আরো আছে সিংহ, ভাল্লুক, গয়াল, কুমির, হরিণ ইত্যাদি।

(ii) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, গাজীপুর। এটি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার মাওনা অঞ্চলে অবস্থিত। আয়তন ৪৯০৯ একর বনভূমি। ২০১১ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৩ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এটি থাইল্যান্ডের সাফারিওয়ার্ল্ড-এর মডেলে তৈরি করা হয়েছে। প্রধান উদ্ভিদ শাল। বন্যপ্রাণী-বাঘ, সিংহ, হাতি, সাম্বার, হরিণ, বানর, হনুমান, ভাল্লুক, গয়াল, কুমির এবং বিভিন্ন পাখি।

৪। **বন্যজীব অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary) :** এমন প্রাকৃতিক অঞ্চল যেখানে মাটি, পানি, উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব সুরক্ষার জন্য অক্ষত রাখা হবে যাতে করে সব ধরনের জীব মুক্তভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে। বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বন্যজীব অভয়ারণ্য হলো—

উল্লেখযোগ্য বন্যজীব অভয়ারণ্য

সংরক্ষিত এলাকার নাম	স্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১। রেমাকেলেঙ্গা অভয়ারণ্য	হবিগঞ্জ	১৭৯৫	১৯৯৬
২। চর কুকড়ি-মুকড়ি (সবচেয়ে ছোটো) "	ভোলা (প্রথম)	৪০	১৯৮১
৩। সুন্দরবন (পূর্ব) "	বাগেরহাট	৩১২২৬	১৯৯৬
৪। সুন্দরবন (পশ্চিম) (সবচেয়ে বড়ো) "	সাতক্ষীরা	৭১৫০২	১৯৯৬
৫। সুন্দরবন (দক্ষিণ) "	খুলনা	৩৬৯৭০	১৯৯৬
৬। পাবলাখালী "	রাঙ্গামাটি	৪২০৮৭	১৯৮৩
৭। চুনতি "	চট্টগ্রাম	৭৭৬৩	১৯৮৬
৮। ফাশিয়াখালী "	কক্সবাজার	১৩০২	২০০৭
৯। দুপপুকুরিয়া-ধুপাছড়ি "	চট্টগ্রাম	৪৭১৬	২০১০
১০। হাজারিখিল "	চট্টগ্রাম	২৩৩১	২০১০
১১। টেকনাফ (এটি পূর্বে গেমরিজার্ভ ছিল) "	কক্সবাজার	১১৬১৫	২০১০
১২। সাঙ্গু "	বান্দরবান	২৩৩১	২০১০
১৩। টেংগ্রাগিরি "	বরগুনা	৪০৪৮	২০১০
১৪। দুধমুখী "	বাগেরহাট	৫৬০	২০১২
১৫। ধাংগমারি "	বাগেরহাট	৩৪০	২০১২
১৬। সোনারচর "	পটুয়াখালী	২০২৬	২০১১
১৭। নাজিগঞ্জ (ডলফিন) "	পাবনা	১৪৬	২০১৩
১৮। পদ্মা সেতু অভয়ারণ্য। এটি সৃজিত। সেতুর দক্ষিণ পাড়ে সৃজন করা হয়েছে।			

৫। **গেম রিজার্ভ :** এমন প্রাকৃতিক অঞ্চল যেখানে বন্যজীব সুরক্ষিত থাকবে, তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে শিকার করা যাবে। বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভটি ছিল কক্সবাজার জেলার নাফ নদীর তীরে অবস্থিত টেকনাফ গেম রিজার্ভ। বর্তমানে এটি বন্যজীব অভয়ারণ্য।

৬। **বিশ্ব ঐতিহ্য (World Heritage) :** ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন এলাকা বা স্থাপনাকে বিশ্বসম্পদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনের তিনটি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যকে ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করে এবং বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবনকে ১৯৯৯ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট ঘোষণা করে।

CamScanner

৭। **মৎস্য অভয়াশ্রম (Fish Sanctuary) :** অভয়ারণ্যে বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণী সংরক্ষিত হয়। তাই মাছের জন্য পৃথক অভয়াশ্রমের প্রয়োজন দেখা দেয়, বিশেষ করে দেশি মাছের জন্য। এ ধরনের অভয়াশ্রম হলো বৃহত্তর সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওর ও হাকালুকি হাওর এবং চট্টগ্রামের মাছ প্রজনন কেন্দ্র হালদা নদী।

টাঙ্গুয়ার হাওর (Tanguar Haor) : বাংলাদেশের একটি প্রখ্যাত ওয়েটল্যান্ড হলো টাঙ্গুয়ার হাওর। এটি সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা ও তাহিরপুর উপজেলায় অবস্থিত। ৫১টি জলমহাল নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওর গঠিত। স্থানীয়ভাবে এটি **'ছয় কুড়ি বিল নয় কুড়ি কান্দা'** নামে পরিচিত। আয়তন প্রায় ১০ বর্গকিলোমিটার। টাঙ্গুয়ার হাওরকে ১৯৯৯ সালে ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং ২০০০ সালে একে **Ramsar site** ঘোষণা করা হয়।

এ হাওরে প্রায় ১৩৫টি প্রজাতির মাছ, ১১টি প্রজাতির উভচর, ৩৫টি প্রজাতির সরীসৃপ এবং ২০৮ প্রজাতির পাখি যার ৯২টি প্রজাতি জলচর পাখি এবং ৯৮টি প্রজাতির যাযাবর (migratory) পাখি বাস করে। টাঙ্গুয়ার হাওর মাছের এক বিশাল ভাণ্ডার এবং আমাদের দেশের মিঠাপানির (স্বাদুপানির) মাছের বংশবৃদ্ধির উন্মুক্ত স্থান। এগুলোর মধ্যে ১০টি প্রজাতি ২০০৩ সালে IUCN এর Red Data Book-এ তালিকাভুক্ত হয়েছে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে। টাঙ্গুয়ার হাওরকে বলা হয় **বিনামূল্যের সম্পদ ভাণ্ডার**। এখানকার উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ প্রজাতি হলো হিজল, করচ, বরুন ইত্যাদি।

Ramsar Site : রামসার ইরানের একটা শহরের নাম। এখানে জলজ বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এ সভায় যোগদান করেন। জলজ বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য টাঙ্গুয়ার হাওরকে এ সভায় চিহ্নিত করা হয়। তাই এ হাওরটিকে ইরানের রামসার শহরের নাম অনুসারে বলা হয় "Ramsar site"।

হাকালুকি হাওর (Hakaluki Haor) : আয়তনের দিক থেকে হাকালুকি হাওর বিশ্বের সর্ববৃহৎ। এর আয়তন ১৮১.১৫ বর্গকিলোমিটার। মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলার পাঁচটি উপজেলায় (কুলাউড়া, জুরি, বড়লেখা, গোলাপগঞ্জ ও ফেঞ্চুগঞ্জ) এর বিস্তৃতি। ১৯৯৫ সাল হতেই এটি ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া এবং রামসার সাইট হিসেবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ হাওরে আছে বহু প্রজাতির দেশি মাছ ও অন্যান্য প্রাণী, আর আছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি। শাপলা, পদ্মসহ বহু প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ এখানে জন্মে থাকে।

হালদা নদী (Halda River) : হালদা নদী বাংলাদেশের অধিকাংশ কার্প জাতীয় (রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিগনি) মাছের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। এটি খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের হালদাছড়া থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এটি ফটিকছড়ির রাউজান, হাটহাজারীর কালুরঘাট ও চাঁদগাঁও-এর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পরিশেষে কর্ণফুলী নদীতে পড়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯৮ কিলোমিটার। এ নদীতে সময়মতো ও সঠিক মতো

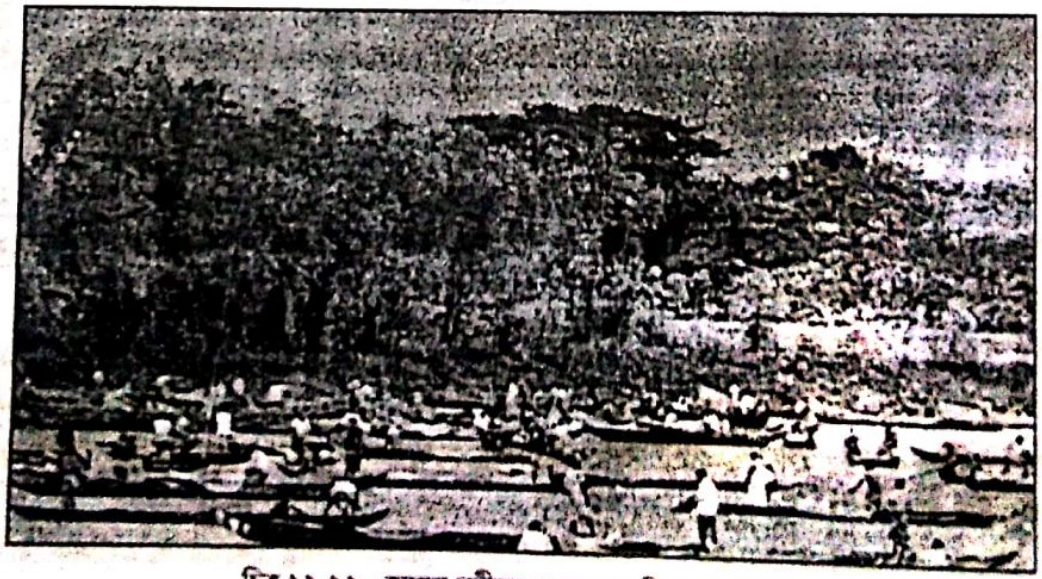

চিত্র ১২.২২ : হালদা নদীতে জেলেদের ডিম ধরার দৃশ্য

ডিমপাড়ার ওপর আমাদের মাছের চাহিদা পূরণের অনেকটাই নির্ভর করে। জাতীয় অর্থনীতিতে এ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। বলা হয়ে থাকে এটি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র। সাধারণত

এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের প্রথম দিকে এখানে মা-মাছেরা ডিম পাড়ে এবং জেলেরা তা সংগ্রহ করে। নদী দূষণের কারণে ডিমের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। এ প্রজননক্ষেত্র অবশ্যই দূষণ মুক্ত রাখতে হবে। ২০২০ সালে সর্বোচ্চ পরিমাণ ডিম আহরিত হয়েছে। ২০২৩ সালের জুন মাসে মা-মাছেরা পর্যাপ্ত ডিম ছেড়েছে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে হালদা নদীকে **"বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ"** ঘোষণা করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে হালদা নদীর দখল-দূষণ কমবে। পরবর্তীতে CCTV ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে।

বর্ষা মৌসুমে নদীর কিছু পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের জন্য এখানে মা-মাছ ডিম ছাড়তে আসে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক।

অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় বজ্রপাতসহ প্রচুর বৃষ্টি, উজানের পাহাড়ি ঢল, তীব্র স্রোত, ফেনিল ঘোলা পানিসহ নদীর ভৌত-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বিত ক্রিয়ায় হালদা নদীতে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তাতে রুইজাতীয় মাছ বর্ষাকালে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। এ পরিবেশ বাংলাদেশের অন্যান্য নদ-নদী থেকে স্বতন্ত্র। তাই হালদা নদী বাংলাদেশের **প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্য**। হালদা নদী কেবল প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ঐতিহ্য নয়–এটি ইউনেস্কোর শর্তানুযায়ী **বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্যেরও** যোগ্যতা রাখে।

(খ) **কৃত্রিম বাসস্থানে সংরক্ষণ বা এক্স-সিটু সংরক্ষণ (Ex-situ conservation) :** বায়োডাইভারসিটির উপাদানসমূহকে তাদের মূল বাসস্থান বা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক পরিবেশের বাইরে বাঁচিয়ে রাখাই হলো **এক্স-সিটু সংরক্ষণ**। সিলেট বনের আগর গাছকে বা সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাগিয়ে সংরক্ষণ করা হলো এক্স-সিটু সংরক্ষণ এর একটি উদাহরণ। নিম্নলিখিত উপায়ে এক্স-সিটু সংরক্ষণ করা হয়।

১) **উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেন (Botanical garden) :** সারা বিশ্বে প্রায় ২,০০০ বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। বোটানিক গার্ডেনে সাধারণত দুর্লভ প্রজাতি, অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতি এবং ট্যাক্সোনমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির গাছ লাগানো হয়। বিশ্বের মোট পুষ্পক উদ্ভিদ প্রজাতির প্রায় চার ভাগের এক ভাগ প্রজাতির উদ্ভিদ লাগানো আছে বোটানিক গার্ডেনগুলোতে। কাজেই বিলুপ্তির হাত থেকে উদ্ভিদ প্রজাতিকে সংরক্ষণের একটি বড়ো উপায় হলো বোটানিক গার্ডেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক গার্ডেনে এমন কিছু প্রজাতি সংরক্ষিত আছে যা বাংলাদেশের আর কোথাও নেই।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাজ নিম্নরূপ :

(i) পাবলিক সার্ভিস (সামাজিক, কালচারাল, অর্থনৈতিক, বিনোদনমূলক, বিশেষ কাজ) যেমন—ফ্লাওয়ার শো,
(ii) শিক্ষা, (iii) কনজার্ভেশন, (iv) গবেষণা, (v) হার্বেরিয়াম এবং প্রকাশনা—

পৃথিবীর প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন ছিল থিওফ্রাস্টাস-এর স্কুল (লাইসিয়াম = Lyceum) সংলগ্ন গার্ডেন। তারপর উল্লেখযোগ্য বোটানিক্যাল গার্ডেন হলো ইতালির Lucaghini (১৪৯০–১৫৫৬) নামক উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গার্ডেন। পরবর্তীকালে বোটানিক্যাল গার্ডেনের মধ্যে ইতালির Padua বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গার্ডেন (১৫৪৫) উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেন যা ১৯৪০ দশকের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

এ গার্ডেনে অনেক দুর্লভ উদ্ভিদ আছে। দেশের বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন হলো ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিরপুর, ঢাকা। এটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ৮৪.২ হেক্টর জায়গার এক বিশাল গার্ডেন। এ গার্ডেনে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, অর্কিড মিলে প্রায় ৫৭,০০০ উদ্ভিদ নমুনা আছে। এ গার্ডেনে কোনো হার্বেরিয়াম নেই, তবে এর এক কোণে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম অবস্থিত।

বিনোদন বা শখের বাগান বোটানিক্যাল গার্ডেন নয়। বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে সৃজন করা গার্ডেনই বোটানিক্যাল গার্ডেন।

ঈশ্চরচন্দ্র গুপ্ত ব্যবসার জন্য "চৈতন্য নার্সারি" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮৯৪ সালে জামালপুরে। বলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী ১৯০৯ সালে ঢাকার ওয়ারীতে একটি শখের বাগান বলধা গার্ডেন তৈরি করেন। বহু বিদেশি দুর্লভ উদ্ভিদ

সমৃদ্ধ হয়ে এটি এখনো টিকে আছে। বর্তমানে বাংলাদেশ বনবিভাগ এ বাগানকে বোটানিক্যাল গার্ডেন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।

২। **বীজ ব্যাংক (Seed bank) :** সীড ব্যাংকের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ একটি সহজতর উপায়, কারণ সীড ব্যাংকে অল্প জায়গায় অল্প পরিশ্রমে ও অল্প খরচে অধিক প্রজাতি ধরে রাখা যায়। সীড ব্যাংকে এমন অনেক উদ্ভিদ প্রজাতির বীজ সংরক্ষিত আছে যা বাস্তবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। *Bronus interruptus* (Kackel) Druce এবং *Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla এমন দুটি প্রজাতি যারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সীড ব্যাংকে এদের বীজ সংরক্ষিত আছে।

বীজকে শুকিয়ে –20°C তাপমাত্রায় ফ্রিজিং করলে প্রায় অধিকাংশ উদ্ভিদ প্রজাতির বীজকেই (orthodex seed) শতাব্দীর পর শতাব্দী অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসহ সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এ ধরনের বীজ মোট সবীজী উদ্ভিদের প্রায় ৭০ ভাগ। অন্য ৩০ ভাগ বীজ recalcitrant বীজ হিসেবে পরিচিত। যেসব বীজকে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় তা হলো রিক্যালসিট্র্যান্ট বীজ, যেমন— আম, কাঁঠাল।

৩। **ফিল্ড জিন ব্যাংক (Field gene bank) :** ফিল্ড জিন ব্যাংকের মাধ্যমে রিক্যালসিট্র্যান্ট বীজবাহী উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা সম্ভব। কোনো প্রজাতির স্বাভাবিক এলাকার বাইরে অন্য কোনো স্থানে এসব প্রজাতির জীবন্ত নমুনা সংরক্ষণ করা হয়। ক্রপ প্রজাতির জন্য এ প্রক্রিয়া উত্তম। কাসাভার জন্য কলম্বিয়াতে ফিল্ড জিন ব্যাংক আছে। বাংলাদেশের হর্টিকালচার সেন্টারগুলোতে আম, লিচু ও নারিকেলের ফিল্ড জিন ব্যাংক রয়েছে।

৪। **জিন ব্যাংক (Gene bank) :** উদ্ভিদের জিন তত্ত্বের সম্পদগুলোকে সংরক্ষণে এবং পৃথিবীর বিশাল শস্য প্রকরণ (variety) এবং তাদের বন্য প্রজাতিগুলো সংরক্ষণের ও উৎপাদনে জিন ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনাগুলোকে সময়ে সময়ে জন্মানো হয় এবং এ থেকে নতুন বীজ উৎপন্ন করে সংরক্ষণ করা হয়।

৫। **চিড়িয়াখানা (Zoo) :** চিড়িয়াখানা এমন এক ধরনের স্থাপনা (এলাকা) যেখানে জীবন্ত বন্য প্রাণীসমূহ খাচায় বন্দী করে রেখে সেখানে বিনোদন, গবেষণা ও প্রজননের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এটা জাতীয় পর্যায়ে এক বৃহৎ পরিসরে আবার ব্যক্তি পর্যায়ে ক্ষুদ্র পরিসরে গড়ে ওঠে। উদাহরণ-মিরপুর জাতীয় চিড়িয়াখানা।

৬। **নিম্নতাপমাত্রায় সংরক্ষণ (Low temperature conservation) :** অঙ্গজ বংশবিস্তারে সক্ষম এমন অনেক ফসলের অঙ্গজ অংশ (যেমন-রাইজোম, বাল্ব, টিউবার, করম) সাধারণত অল্প জীবনকাল সম্পন্ন এবং দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায়, যদি না এদেরকে উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। ৯০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা ৪°–৫° সে. তাপমাত্রায় গোল আলুকে ৫–৭ মাস হিমাগারে সংরক্ষণ করা যায়। আবার ১৪° সে. তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতায় মিষ্টি আলু কয়েক মাস সংরক্ষণ করা যায়। তবে এভাবে বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না।

৭। **ইন-ভিট্রো সংরক্ষণ (In-vitro conservation) :** ইন-ভিট্রো উপায়ে ল্যাবরেটরিতে রিক্যালসিট্র্যান্ট প্রজাতির ক্যালাস (callus) টিস্যু সংরক্ষণ করা যায় বা তরল আবাদ মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা যায়। অতি নিম্নতাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে Cryogenic পদ্ধতিতেও (–১৯৬° সেন্টিগ্রেড) এদেরকে সংরক্ষণ করা যায়, তবে এতে সময়, খরচ ও অধিক সতর্কতার দরকার হয়।

৮। **ডিএনএ সংরক্ষণ (DNA conservation) :** উদ্ভিদ থেকে DNA আহরণ করে তা সংরক্ষণ করা হয়। DNA সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও কাঙ্ক্ষিত জিন সংরক্ষণ করা যায় কিন্তু এখনো সংরক্ষিত DNA থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টির উপায় উদ্ভাবিত হয়নি।

৯। **পরাগরেণু সংরক্ষণ (Pollen grain conservation) :** পরাগরেণুকে নিম্নতাপমাত্রায় দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা এবং পরে জীবন্ত উদ্ভিদের সাথে ক্রসিং-এ ব্যবহার করা যায়। সংরক্ষিত পরাগ থেকে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে হ্যাপ্লয়েড সৃষ্টি করা যাবে। পরাগ সংরক্ষণের মাধ্যমে কেবল উদ্ভিদের পুরুষ দিকটি সংরক্ষিত হয়, স্ত্রী দিকটি নয়।

কোন কোন প্রজাতি সংরক্ষণের দাবিদার

এক্স-সিটু কনজার্ভেশনে সব উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়, তাই কোন কোন উদ্ভিদ প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার পাবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করতে হবে। সংরক্ষণের ব্যাপারে অগ্রাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়।

(i) দুর্লভ (rare) এবং সংকটাপন্ন (endangered) প্রজাতি প্রথম অগ্রাধিকার পাবে।

(ii) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দরকারি উদ্ভিদ প্রজাতির নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি অগ্রাধিকার পাবে, কারণ এসব নিকট সম্পর্কযুক্ত উদ্ভিদ জেনেটিক সম্পদের (genetic material) উৎস হিসেবে কাজ করে; যেমন— রোগ প্রতিরোধক্ষম জিন।

(iii) ট্যাক্সোনমিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতি ও তার নিকট সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি সংরক্ষণে অগ্রাধিকার পাবে।

দলগত কাজ : কোনো বোটানিক্যাল গার্ডেন, ন্যাশনাল পার্ক, অভয়াশ্রম, অভয়ারণ্য ভ্রমণ করে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন তৈরি করো এবং শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করো।

ইন-সিটু কনজারভেশন ও এক্স-সিটু কনজারভেশনের মধ্যে পার্থক্য

ইন-সিটু কনজারভেশন	এক্স-সিটু কনজারভেশন
১। স্বাভাবিক বাসস্থানের পরিবেশের মধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে ইন-সিটু কনজারভেশন বলে।	১। জীবকে তার নিজস্ব বাসস্থান থেকে এনে অন্যত্র (বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা) কনজার্ভ করা হলো এক্স-সিটু কনজারভেশন। এছাড়া জীবের প্রোটোপ্লাজমযুক্ত কোষ, স্পার্মাটোজোয়া, ওভাম ইত্যাদিকে ঋণাত্মক উষ্ণতায় সংরক্ষিত করাকেও এক্স-সিটু কনজারভেশন বলে।
২। একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিকে ইন-সিটু কনজারভেশন করলে তার সাথে সম্পর্কিত অন্য জীবরাও সংরক্ষিত হবে।	২। এ ধরনের ঘটনার সুযোগ নেই।
৩। জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ইত্যাদির মাধ্যমে ইন-সিটু কনজারভেশন করা হয়।	৩। চিড়িয়াখানা, বীজ-ব্যাংক, স্পার্ম ও ওভাম ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে এক্স-সিটু কনজারভেশন করা হয়।
৪। অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম শ্রমের প্রয়োজন।	৪। অপেক্ষাকৃত কঠিন ও অধিক শ্রমের প্রয়োজন।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Importance of biodiversity conservation)

ধীরগতিতে জীববৈচিত্র্য সৃষ্টি ও ধ্বংস একটি প্রাকৃতিক ব্যাপার। কিন্তু গত এক শতাব্দী যাবৎ ধ্বংসের হার সৃষ্টির চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। এর মূল কারণ মানুষের কর্মকাণ্ড। বন ধ্বংস ও জলাশয় ভরাট করে কৃষিজমি সম্প্রসারণ; অধিক ফলনের জন্য রাসায়নিক সার, আগাছানাশক, কীটপতঙ্গ নাশক, ছত্রাক নাশক প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার; নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য অধিক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস ও মাত্রাতিরিক্ত বনজ সম্পদ আহরণ ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক বনভূমি ও জলাভূমি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। প্রাণিকুল তার খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য সরাসরি উদ্ভিদকুলের ওপর নির্ভরশীল থাকায় বনভূমি ও জলাভূমি হ্রাসের সাথে সাথে বহু প্রাণী প্রজাতিও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অথবা বিপন্ন অবস্থায় আছে। একসময় আমাদের পত্রঝরা বনে ময়ূর ছিল বলে জানা যায়। আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও শালবনে বাঘ ছিল, বানরের জন্য বনের ধারে বাড়িতেও থাকা যেতো না। এখন ময়ূর নেই, বাঘও নেই, বানরও প্রায় নেই বললেই চলে।

জীবপ্রজাতির দ্রুত হ্রাসের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা দেখা দিয়েছে এবং দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু। ঝড়, টর্নেডো, হ্যারিকেন, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েই চলেছে। এসব কারণে মানুষের অস্তিত্বই আজ হুমকির মুখে। কাজেই মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই পৃথিবীব্যাপী জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছে। সৃষ্টি হয়েছে IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources);

WWF (World Wildlife Fund & Nature) ; UNEP (United Nations Environmental Program); WCMC (World Conservation Monitoring Centre); CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), EAS (Environmental Awareness Strategies), UNICEF (United Nations International Children Emergence Fund) প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থা।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

নিজ দেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ওপর নির্ভর করার চেয়ে নিজেরাই সচেতন হবো এবং অন্যদেরকে সচেতন করবো। জনগণকে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব বোঝাতে পারলে সহজেই আমাদের এ অমূল্য সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে ভারতের হিমালয় অঞ্চলের 'চিপকো' আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। চিপকো স্থানীয় আদিবাসী শব্দ যার অর্থ হলো **লেপ্টে থাকা**। কোনো বৃক্ষ কাটতে এলে ঐ আন্দোলনের কর্মীরা গাছের সাথে লেপ্টে থাকে, ফলে ঐ গাছটি কাটার হাত থেকে রক্ষা পায়। স্থানীয় জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আমাদেরও অবস্থা অনুযায়ী কোনো উপায় আবিষ্কার করতে হবে।

যাহোক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বকে নিম্নলিখিত উপায়ে নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা যায়।

১। **জীববৈচিত্র্য ও কৃষি :** কৃষি উন্নয়নের জন্য জীববৈচিত্র্য থাকা অপরিহার্য। ফসলী উদ্ভিদের নিকট সম্পর্কযুক্ত বন্য উদ্ভিদের জিন ব্যবহার করে আমাদের কৃষি প্রজাতির ফলন অনেক বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ফসলী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে, ক্ষরাসহিষ্ণু, লোনা জলসহিষ্ণু প্রকরণও সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে। তাই জীববৈচিত্র্য (বিশেষ করে বন্য জীববৈচিত্র্য) মানব সমাজের খাদ্য যোগানের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

২। **জীববৈচিত্র্য ও মাছের চাহিদা :** বহু জাতের মাছ আছে, এদের পুষ্টিমানও পার্থক্যমণ্ডিত। আবার মানুষের পছন্দের চাহিদাও বহুমুখী। আবার এক মাছ আরেক মাছের খাবার। কাজেই জীবকুল যত বৈচিত্র্যময় হবে, আমাদের নিজস্ব চাহিদাও ততটাই পূরণ হবে।

৩। **জীববৈচিত্র্য ও ওষুধ :** মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জীববৈচিত্র্য নির্ভর। নতুন নতুন উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণায় নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে। মানুষের জেনেটিক পার্থক্য ব্যাপক, বর্তমানের রোগের ধরনও ব্যাপক। কাজেই বৈচিত্র্যময় চাহিদা মেটাতে ব্যাপক বৈচিত্র্যময় জীব প্রজাতি থাকা অপরিহার্য। আমেরিকার The National Cancer Institute ৩৫,০০০ হাজার বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির এক লক্ষটি নির্যাস পরীক্ষা করে মাত্র একটি থেকে **Taxol** (Pacific Yew Tree থেকে) নামক ক্যান্সার কেমোথেরাপির ওষুধ প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। ৩৫,০০০ হাজার প্রজাতির মাঝ থেকে যদি এ একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতো তাহলে কেমোথেরাপির এ ওষুধটি আর আবিস্কৃত হতো না। এ থেকেই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

৪। **জীববৈচিত্র্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য :** ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কযুক্ত। নির্মাণসামগ্রী, বুননসামগ্রী, ওষুধ, রং, মোম, কাগজ শিল্প, কর্ক শিল্প, রাবার শিল্প ইত্যাদি বহু ধরনের সামগ্রী জীবজগৎ থেকে আসে। বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ, বৈচিত্র্যময় সামগ্রীর যোগান দেয়। জীববৈচিত্র্য সংকুচনের সাথে সাথে আমাদের ব্যবসা ও শিল্প সংকুচিত হবে।

৫। **জীববৈচিত্র্য ও ইকোট্যুরিজম :** জীববৈচিত্র্যে ভরপুর এলাকাকে ইকোট্যুরিজমের জন্য বেছে নেয়া হয়। বৈচিত্র্যময় জীব দেখার জন্য দেশ-বিদেশের প্রচুর লোক সেখানে যায় এবং এর মাধ্যমে দেশ বিপুল অংকের মুদ্রা (বৈদেশিক মুদ্রাসহ) লাভ করে।

৬। **জীববৈচিত্র্য ও এথনোবায়োলজি :** উপজাতীয় জনগোষ্ঠী তাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন ধরনের জীবকে সংযুক্ত করেছে। সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের সাথে তাদের সমৃদ্ধ জীবন-যাপন নির্ভরশীল। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ উপজাতীয় গোষ্ঠীর সুন্দর জীবনযাপনের জন্য সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য দরকার।

৭। **জীববৈচিত্র্যের নান্দনিক গুরুত্ব :** জীববৈচিত্র্যের নান্দনিক গুরুত্ব অপরিসীম। জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ পরিপাটি একটি মনোরম পরিবেশ মানুষকে দিয়ে থাকে অনাবিল আনন্দ, মানসিক শান্তি ও দৈহিক প্রশান্তি। মানসিক শান্তি মানুষকে করে চিন্তামুক্ত, রোগমুক্ত ও দীর্ঘজীবী। এটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য অধিক উপযোগী।

CamScanner

৮। জীববৈচিত্র্য এবং অবকাশ যাপন ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব : জীববৈচিত্র্য কবি সাহিত্যিক ও চিত্র শিল্পীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগায়, কাজে আনে নতুনত্ব ও গতি। অনেকেই অবসর সময় বাগান করে, পাখি পালন করে, অ্যাকুরিয়ামে সুন্দর মাছ চাষ করে।

৯। জীববৈচিত্র্যের ইকোলজিক্যাল গুরুত্ব : জীববৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ইকোসিস্টেম পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। যেকোনো ইকোসিস্টেমের ১/২টি কীস্টোন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলে সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমটি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ফুড চেইন ও ফুড ওয়েব দুটিই জীববৈচিত্র্যনির্ভর। কাজেই জীববৈচিত্র্যের ইকোলজিক্যাল গুরুত্ব অপরিসীম।

১০। শরণার্থী হ্রাস : বিশ্বের বহুস্থানে পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে শরণার্থী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে ১ জন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭ জনে ১ জন জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করলে জলবায়ুগত অসুবিধাগুলো দূর হবে এবং সঠিকভাবে পরিকল্পনা নিলে শরণার্থী সংখ্যা হ্রাস পাবে।

IUCN Red List Categories

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) একটি বিশ্বভিত্তিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকারী সংস্থা, বিলুপ্ত বা বিলুপ্তির আশঙ্কায় আছে এমন উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা করেছে, যা IUCN Red List নামে পরিচিত। নিরন্তর গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের আলাপ-আলোচনার পর IUCN এ সংক্রান্ত কতিপয় ক্যাটাগরি (শ্রেণি) নির্ধারণ করে দিয়েছে। IUCN এর বর্তমান নাম World Conservation Union (WCU)।

ক্যাটাগরিসমূহ নিম্নরূপ :

১। **Extinct Species বা বিলুপ্ত প্রজাতি** : যে প্রজাতিটির সম্ভাব্য সব বাসস্থান এবং বছরের সব ঋতুতে পর্যায়ক্রমিক অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর পর নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, প্রজাতিটির সর্বশেষ সদস্যটির মৃত্যু হয়েছে। এর আর কোনো সদস্য বেঁচে নেই। বাংলাদেশের এন্ডেমিক *Nothopegia acuminata* J. Sinclair এখন বিলুপ্ত।

২। **Extinct in the Wild বা বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত** : যে প্রজাতিটি তার প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশে আর পাওয়া যায় না বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে কিন্তু বাগানে চাষাবস্থায় বা কোথাও পালিত অবস্থায় (প্রাণীর ক্ষেত্রে) এখনও সংরক্ষিতভাবে জীবিত সদস্য রয়েছে তাকে বলা হয় বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত। *Anthurium leuconeurum* এমন একটি প্রজাতি যা বন্য অবস্থায় বিলুপ্ত কিন্তু Kew garden-এ লাগানো আছে।

৩। **Critically Endangered বা অতিবিপন্ন** : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার মতো চরম ঝুঁকিতে আছে তা হলো অতিবিপন্ন শ্রেণি।

৪। **Endangered Species বা বিপন্ন প্রজাতি** : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি ভবিষ্যতে অতিবিপন্ন অবস্থায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটি হলো বিপন্ন প্রজাতি।

৫। **Vulnerable Species বা বিপদগ্রস্ত/শঙ্কাগ্রস্ত** : বিলুপ্তির কারণসমূহ অব্যাহত থাকলে যে প্রজাতিটি ভবিষ্যতে বিপন্ন শ্রেণিভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা হলো বিপদগ্রস্ত বা শঙ্কাগ্রস্ত শ্রেণি।

৬। **Rare Species বা বিরল প্রজাতি** : এসব প্রজাতির পপুলেশন সংখ্যা খুব কম এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত বা কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমিত থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতিবিপন্ন, বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত শ্রেণি তিনটিকে একত্রে হুমকিগ্রস্ত (threatened) প্রজাতি বলে।

IUCN এর অন্যান্য ক্যাটাগরি হলো Least concern (LC), Data deficient (DD) এবং Not evaluated (NE)

৩, ৪ এবং ৫নং ক্যাটাগরিকে বলা হয় Threatened Category.

দলগত কাজ : এলাকার বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর তথ্য অনুসন্ধান, তালিকাকরণ, ফটোগ্রাফকরণ ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি। বছর শেষে কাজের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে জমা দিতে হবে।

CamScanner

গ্লোবাল ওয়ার্মিং, না ক্লাইমেট চেইঞ্জ

বিশ্বব্যাপী এখন আলোচনার বিষয় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (global warming) এবং বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন (climate change)। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার প্রধান কারণ হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের ক্রমবৃদ্ধি, অধিক হারে অরণ্য ধ্বংস, সম্প্রসারিত শিল্পায়নসহ আরো অনেক কারণ। গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ। যেমন N_2O, ফ্লোরোকার্বন্স (FCs), জলীয় বাষ্প ইত্যাদি।

এক হিসেবে দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব ১৯৫৯ সালে ছিল ৩১৬ PPm, যা ২০০৮ সালে এসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮৬ PPm; বৃদ্ধির হার ২২.২%। CO_2 গ্যাস বৃদ্ধির মূল কারণ বৃক্ষনিধন এবং জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার। মিথেন গ্যাসের বৃদ্ধি ঘটেছে সবচেয়ে বেশি।

গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের বর্ধিত ঘনত্ব বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে এবং জলবায়ুর ধরনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা দেখছেন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে; তারা এটাকে বলছেন global warming বা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সোলার রেডিয়েশন বায়ুমণ্ডল কতটা শোষণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে এদের ঘনত্ব কত তার ওপরই বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর প্যাটার্ন নির্ভর করে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলাফল

১। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে পর্বত চূড়ার হিমবাহ বা তুষারস্রোত কমে যাওয়া বা সরে যাওয়াতে ঐ অঞ্চলে পানি প্রাপ্তির ঘাটতি দেখা দেয়।

২। মেরু অঞ্চলে পুরু বরফস্তর গলে যাওয়া। গত ৪০ বছরে এ বরফস্তর ২০% গলে গিয়েছে, যার ফলে অতি দ্রুত সাগরে পানির স্তর বেড়ে গেছে। এর ফলে সাগর পারের নিম্ন এলাকা লোনা পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। একই কারণে বিশ্ব জলবায়ুর প্যাটার্নগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেমন অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, হারিকেন, টাইফুন, সুনামি ইত্যাদি।

গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চল অধিকতর ঠাণ্ডা হতে পারে, তাই গ্রিন হাউস গ্যাস বিরূপ প্রভাবকে **বৈশ্বিক উষ্ণতা** (Global warming) না বলে **জলবায়ু পরিবর্তন** তথা Climate Change বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

সার-সংক্ষেপ

জীববৈচিত্র্য : Biodiversity-এর বাংলা জীববৈচিত্র্য করা হয়েছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে পৃথিবীতে বিরাজমান জীবসমূহের সামগ্রিক সংখ্যাপ্রাচুর্য ও ভিন্নতা হলো জীববৈচিত্র্য। জীব বলতে অণুজীব, ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বোঝায়। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির জীব রয়েছে। এরা একটি থেকে অপরটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং পৃথকযোগ্য। একটি প্রজাতির সব ব্যক্তি (individual) সামগ্রিক গঠনে একই রকম হলেও সূক্ষ্মতর বৈশিষ্ট্যে এরা পার্থক্যমণ্ডিত। পৃথিবীর সকল মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রতিটি মানুষই একজন থেকে অপরজন আলাদা। জিনগত পার্থক্যের কারণে একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথকযোগ্য, ভিন্ন। পরিবেশ তথা **ইকোসিস্টেম** জীব প্রজাতিসমূহকে ধারণ করে। একটি ইকোসিস্টেম থেকে অন্য একটি ইকোসিস্টেমের গঠনগত পার্থক্য থাকলে তাদের ধারণকৃত জীবপ্রজাতিসমূহের মধ্যেও পার্থক্য থাকবে। একটি জলজ ইকোসিস্টেমে যে ধরনের জীব বাস করে, একটি স্থল ইকোসিস্টেমে অন্য ধরনের জীব বাস করে। সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমে যে ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে, মধুপুর বনের ইকোসিস্টেমে অন্য ধরনের উদ্ভিদ ও াণী বাস করে। কাজেই দেখা যায়, জীববৈচিত্র্যের সাথে জিন, প্রজাতি ও ইকোসিস্টেম নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই ীববৈচিত্র্যকে সাধারণত তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়। যথা— জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity), প্রজাতিগত চিত্র্য (Species diversity or Taxonomic diversity) এবং ইকোসিস্টেমগত বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity)। এ তিন ার বৈচিত্র্য মিলিতভাবে সৃষ্টি করেছে জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity। প্রাথমিকভাবে Biological Diversity নামে ১৯৮৬ া দুটি প্রবন্ধে বিষয়টি প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালে Walter Rosen দুটি শব্দকে মিলিয়ে Biodiversity বে প্রকাশ করেন।

নজারভেশন : কনজারভেশন (conservation) শব্দটি জীববৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য রাখার নামই কনজারভেশন। কনজারভেশন হলো মানুষ কর্তৃক জীবমণ্ডলের ব্যবহার সংক্রান্ত এমন ব্যবস্থাপনা যা বিমণ্ডল বর্তমান প্রজন্মের জন্য সর্বোচ্চ মাত্রায় সুফল প্রদান করতে পারে এবং একই সাথে ভবিষ্যৎ